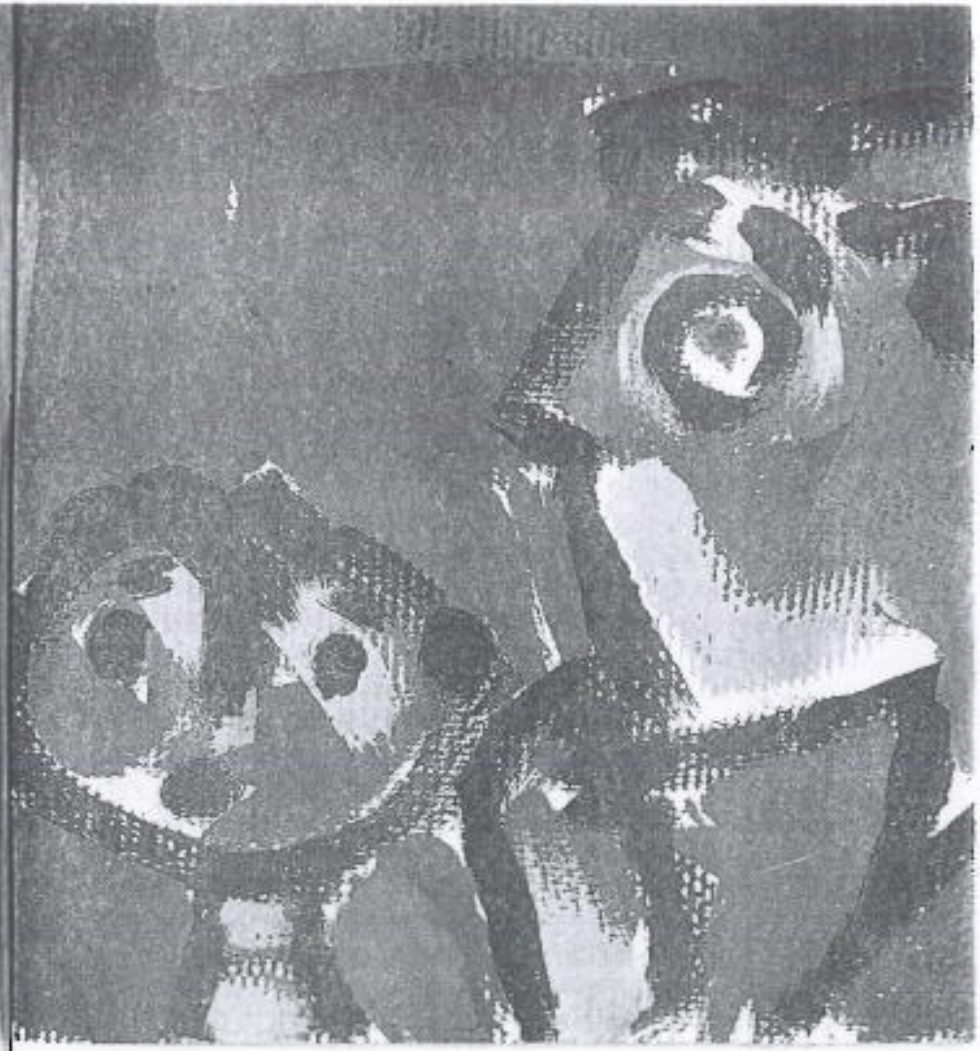

বাচ্চা ভয়ংকর কাচ্চা ভয়ংকর

১

রইসউদ্দিনকে দেখলে মনে হবে তিনি বুঝি একজন খুব সাধারণ মানুষ। তাঁর চেহারা সাধারণ (মাথার সামনে একটু টাক, আধপাকা চুল, নাকের নিচে ঝাঁটার মতো গোঁফ), বেশভূষা সাধারণ (হাফহাতা শার্ট, ঢলঢলে প্যান্ট, পায়ে ভুসভুসে টেনিস শু), কথা বলার ভঙ্গিও সাধারণ (যখন বলার কথা 'দেখলুম' 'খেলুম' তখন বলে ফেলেন 'দেইখা ফালাইছি' 'খায়া ফালাইছি')। রইসউদ্দিনের কাজকর্মও খুব সাধারণ, একটা বিজ্ঞাপনের ফার্মে তাঁর নয়টা-পাঁচটা কাজ, সারাদিন বসে বসে নানান ধরনের কোম্পানি-ফার্মের দরকারি ছবি, কাগজপত্র, প্লেট ফাইলবন্দি করে রাখেন।

দেখতে-শুনতে বা কথা বলতে সাদাসিধে মনে হলেও রইসউদ্দিন মানুষটা কিন্তু খুব সাহসী। দেশে যখন মুক্তিযুদ্ধ হয় তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোলো। সেই বয়সে তিনি একেবারে ফাটাফাটি যুদ্ধ করেছিলেন। নান্দাইল রোডে এক অপারেশনে একেবারে খালিহাতে একবার তিনজন পাকিস্তানিকে ধরে এনেছিলেন। এখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ কিন্তু এতদিনেও তাঁর সাহসের এতটুকু ঘাটতি হয়নি। অফিসের বড় সাহেব একবার তাঁর সাথে কী-একটা বেয়াদবি করেছিলেন, রইসউদ্দিন তাঁর কলার ধরে দেওয়ালে ঠেসে ধরে বলেছিলেন, "আর একবার এই কথা বলেছেন কি জানালা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেব। বলবেন আর?"

বড় সাহেব মিনমিন করে বললেন, "না।" রইসউদ্দিন তখন তাঁকে ছেড়ে দিলেন। বড় সাহেব এরপর জীবনে আর কোনোদিন রইসউদ্দিনকে ঘাঁটাননি।

রইসউদ্দিন যে সাহসী তার আরও অনেক প্রমাণ আছে। যেমন ধরা যাক তাঁর পোষা সাপের কথা। সাধারণ মানুষ সাপ পোষা দূরে থাকুক, যেখানে সাপ রয়েছে তার ধারেকাছে যাবে না, কিন্তু রইসউদ্দিন একবার দুটো কেউটে সাপ পুষেছিলেন। কথায় বলে 'দুধ-কলা দিয়ে কালসাপ পোষা'— কিন্তু সাপ পুষে রইসউদ্দিন আবিষ্কার করলেন সাপ দুধ-কলা মুখে নেয় না, তাদের প্রিয় খাবার হচ্ছে ইঁদুর আর ব্যাং। যা-ই হোক, সাপ দুটি একদিন বেড়াতে বেড়াতে পাশের বাসায় হাজির হল, ভয়ংকর হৈচৈ শোনা গেল তারপর দুই মিনিটের মাঝে লঠির আঘাতে সেই সাপের জীবন শেষ। রইসউদ্দিন মনের দুঃখে সাপ পোষাই ছেড়ে দিলেন।

রইসউদ্দিন শুধু যে সাপকে ভয় পান না তাই না, বাঘ-সিংহকেও ভয় পান না। চিড়িয়াখানায় গেলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে বাঘের কান চুলকে দেন, সিংহের কেশরে বিলি কেটে দেন। শুধু বাঘ-সিংহ নয়, চোর-ডাকাতকেও তাঁর কোনো ভয় নেই।

একবার গভীর রাতে চোখ খুলে দেখেন ষণ্ডাগোছের একজন মানুষ তাঁর ড্রয়ার ঘাঁটাঘাঁটি করছে। রইসউদ্দিন "কে রে?" বলে হুংকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই মানুষটা পিছলে বের হয়ে গেল। রইসউদ্দিন তখন আবিষ্কার করলেন চোরেরা গায়ে তেল এবং পাকা কলা মেখে চুরি করতে আসে।

রস্তামাটেও তিনি চোর-ডাকাত আর বদমাইশদের ভয় পান না। একদিন বিজয় সরণি দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন কয়জন মাস্তান পিস্তল উঁচিয়ে একটা রিকশাকে ঘিরে রেখেছে। রিকশায় বসে-থাকা মেয়েটি ভয়ে ভয়ে তার গলার হার, হাতের চুড়ি খুলে দিচ্ছে। আশেপাশে অনেক মানুষ—সবাই দূর থেকে দেখছে কিন্তু কেউ কাছে যাবার সাহস পাচ্ছে না।

রইসউদ্দিন এগিয়ে গিয়ে একজন মাস্তানের শার্টের কলার ধরে তাকে এমন রদ্দা দিলেন যে, সাথে সাথে তার একটা কলার-বোন ভেঙে গেল। অন্য দুজন তখন তাদের নাকমুখ খিঁচিয়ে চোখ উলটে বিকট চিৎকার করে রইসউদ্দিনের উপর লাফিয়ে পড়ল, রইসউদ্দিন একটুও না ঘাবড়ে পালটা তাদের মুখে ঘুসি হাঁকালেন। মাস্তানগুলো নেশা-ভাং করে একেবারে দুবলা হয়ে ছিল, গায়ে কোনো জোর ছিল না তাই রইসউদ্দিনের ঘুসি খেয়ে একেবারে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। তারা আসলে গায়ের জোর দেখিয়ে মাস্তানি করে না, সত্যিকারের জোর তাদের অস্ত্রে। হাতে রিভলবারের মতো অস্ত্র থাকার পরেও সেটা কেন ব্যবহার করল না ব্যাপারটা অবিশ্যি একটা রহস্য। মনে হয় সস্তা রিভলবার, ট্রিগার ধরে টানাটানি করলে মাঝেমধ্যে এক-দুইটা গুলি বের হয়— সেই গুলিও যখন উত্তরদিকে যাবার কথা তখন যায়—পুবদিকে! রিভলবারের আসল কাজ হচ্ছে ভয় দেখানো, রইসউদ্দিনের মতো মানুষ, যাদের বুকে ভয়ডর নেই তাদের সামনে তাই মাস্তানরা খুব বেকায়দায় পড়ে যায়।

এই যে রইসউদ্দিন—এত বড় একজন সাহসী মানুষ, তিনিও কিন্তু একটা জিনিসকে খুব ভয় পান। সেই জিনিসটি মাকড়শা নয়, জোঁক বা বিছে নয়, পুলিশ কিংবা মিলিটারি নয়, ঝড় বা ভূমিকম্পও নয়, তিনি বাচ্চাকাচ্চাকে একেবারে যমের মতো ভয় করেন। বাচ্চাকাচ্চা হয়ে যাবে সেই ভয়ে তিনি বিয়ে পর্যন্ত করেননি! বাচ্চাকাচ্চাকে ভয় পাওয়ার পেছনে তাঁর অবিশ্যি কারণ আছে। ছেলেবেলায় তিনি ছোটখাটো ভীতু এবং দুর্বল ধরনের ছিলেন। পাড়ার কাছে যে-স্কুলে তিনি পড়তেন সেখানে দুর্দান্ত ধরনের কিছু বাচ্চা পড়াশোনা করত। রইসউদ্দিনকে দুর্বল পেয়ে বাচ্চাগুলো দুইবেলা তাঁকে পেটাত। পিটুনি খেয়ে খেয়ে সেই যে তাঁর ছোট বাচ্চার একটা ভয় ঢুকে গেল, সেটা আর কখনো দূর হয়নি।

যখন তিনি কলেজে পড়েন তখন পাড়ার বাচ্চাকাচ্চারা মিলে ঠিক করল তারা একটা নাচগানের অনুষ্ঠান করবে। রইসউদ্দিনের উপর ভার পড়ল স্টেজে আলোর ব্যবস্থা করে দেওয়ার। ইলেকট্রিক তার টেনে রইসউদ্দিন যখন সকেট লাগাচ্ছেন তখন এক দুষ্টু ছেলে এসে সেই তার প্লাগের মাঝে ঢুকিয়ে দিল, ইলেকট্রিক শক খেয়ে রইসউদ্দিন একেবারে আঁ আঁ আঁ চিৎকার করে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়লেন। তাই দেখে পাড়ার বাচ্চাকাচ্চাদের সে কী আনন্দ—মুখে হাত দিয়ে তাদের সে কী খিকখিক হাসি!

বছরখানেক আগে তাঁর এক বন্ধু বউ-বাচ্চাকে নিয়ে রইসউদ্দিনের বাসায় বেড়াতে এসেছিল। বাচ্চাটার বয়স পাঁচ বছর, ফুটফুটে চেহারা, মুখে নিষ্পাপ একটা ফেরেশতা ফেরেশতা ভাব, কিন্তু তার কাজকর্ম ছিল একেবারে ইবলিসের কাছাকাছি। ঘরে ঢুকেই

শেলফ থেকে তাঁর প্রিয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা টেনে ফেলে দিল, কবিগুরুর কপাল এবং নাক গেল একদিকে, দাড়ি এবং গোঁফ অন্যদিকে। দুপুরবেলা রইসউদ্দিনের দামি ফাউন্টেন পেনটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাঁর বাম চোখটা গেলে দেওয়ার চেষ্টা করল, চোখে চশমা ছিল বলে চোখটা বেঁচে গেলেও গালের কাছাকাছি খানিকটা চামড়া উঠে গেল। তাঁর নিজের বড় ক্ষতি না হলেও দামি ফাউন্টেন পেনটার একেবারে বারোটা বেজে গেল। খাবার সময় হলে ছেলেটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করতে শুরু করল। এইটুকু মানুষ কীভাবে এত জোরে চিৎকার করে ভেবে রইসউদ্দিন একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। কোনোভাবে তাকে শান্ত করতে না পেরে তার হাতে একটা লাল মার্কার দেওয়া হল। সেই মার্কার দিয়ে কিছুক্ষণের মাঝেই সে সবকয়টি ঘরের দেওয়ালের যেটুকু নাগাল পেল সেটুকুতে ছবি এঁকে ফেলল। বাচ্চাটি আর তার বাবা-মা রইসউদ্দিনের বাসায় ছিল তিন দিন, সেই তিন দিনকে রইসউদ্দিনের মনে হল তিন বছর এবং এই সময়ে তাঁর বাচ্চাভীতি বেড়ে গেল আরও তিনগুণ!

শুধু যে এই বাচ্চাটিই তাঁর মাঝে ভয় ঢুকিয়ে গেছে তাই নয়, অবস্থা দেখে মনে হয় পৃথিবীর সব বাচ্চাই যেন ষড়যন্ত্র করে তাঁর পেছনে লেগে গেছে। রেস্টুরেন্টে চা খেতে গেলে বাচ্চা বয়-বেয়ারারা সবসময় তাঁর কোলে খানিকটা গরম চা ফেলে দেয়। দোকানে কেনাকাটা করতে গেলে ছোট ছোট বাচ্চা মনে হয় ইচ্ছে করেই তাঁর পায়ের তলায় চাপা পড়ার চেষ্টা করে। তাদের বাঁচাতে গিয়ে রইসউদ্দিন নিজে আছাড় খেয়ে পড়েন কিন্তু সেই বাচ্চাদের কখনো কিছু হয় না বরং তাঁকে আছাড় খেতে দেখে সেই বাচ্চারা উলটো আনন্দে হাততালি দিতে থাকে। রাস্তার পাশে যেসব ছোট ছোট বাচ্চা ইট ভাঙে রইসউদ্দিন যখন তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যান তখন অবধারিতভাবে সেইসব ছোট বাচ্চা হাতুড়ি দিয়ে তাঁর পায়ের নখকে অক্ষবিস্তর থেঁতলে দেয়।

একদিন অন্যমনস্কভাবে রিকশায় উঠেছেন, খানিক দূর যাবার পর হঠাৎ ভালো করে তাকিয়ে দেখেন রিকশা চালাচ্ছে একেবারে বাচ্চা একটা ছেলে। রইসউদ্দিন আঁতকে উঠে বললেন, "থামাও—রিকশা থামাও!" তার আগেই সেই রিকশা নিয়ে ছেলেটি রইসউদ্দিনকে রাস্তার পাশে নর্দমায় ফেলে দিল। দেখতে দেখতে তখন তাঁকে ঘিরে ভিড় জমে উঠল এবং এরকম বুড়ো ধামড়া একজন মানুষ যে এত ছোট একটা বাচ্চাকে দিয়ে রিকশা চালিয়ে নিচ্ছে সেইজন্যে সবাই মিলে তাঁকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল।

সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপারটি ঘটেছে মাত্র মাসখানেক আগে। একটা মনোহারী দোকান থেকে রইসউদ্দিন চায়ের প্যাকেট কিনেছেন, হঠাৎ দেখলেন ছোট একটা বাচ্চাও তার বাবা-মায়ের সাথে দোকানে এসেছে। ফুটফুটে বাচ্চা হাঁটিহাঁটি পায়ে দোকানে ঘুরছে, রইসউদ্দিনের দিকে তাকাতেই তিনি ভদ্রতা করে মুখে একটা হাসিহাসি ভাব করলেন। সাথে সাথে বাচ্চার সেকী চিৎকার! তার বাবা-মা ভয় পেয়ে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে বাবা?"

ফুটফুটে বাচ্চাটি রইসউদ্দিনকে দেখিয়ে বলল, "ছেলেধরা!"

সাথে সাথে তাঁকে নিয়ে কী সাংঘাতিক অবস্থা! শুধুমাত্র মানুষটা ভয়ংকর সাহসী বলে কেউ তাঁর গায়ে হাত দিতে পারেনি, কিন্তু পুরো একদিন তাঁর থানা-হাজতে থাকতে হল। কাজেই রইসউদ্দিন যদি ছোট বাচ্চাদের ভয় করেন, তা হলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।

এই রইসউদ্দিনের কাছে একদিন একটা চিঠি এল। চিঠিটা এরকম :

প্রিয় রাইচউদ্দিন,

সালাম পর সমাচার এই যে, আপনাকে বিশেষ প্রয়োজনে পত্র লিখিতেছি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, আপনার ভাই জনাব জমিরউদ্দিন নৌকাডুবিতে সপরিবারে ইনতিকাল করিয়াছেন। তাহার নয় বৎসরের কন্যা শিউলি ঘটনাক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছে। এই এতিম বালিকাটি গত ছয়মাস যাবৎ আমার সহিত বসবাস করিতেছে। আমি কিছু বলিতে চাহি না আবার না বলিয়াও পারিতেছি না যে, এই বালিকাটি অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির । সে আমার পরিবারে বিশেষ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার সহিত মিশিয়া আমার পুত্র ও কন্যাও বখিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। পত্রপাঠ মারফত তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

আরজ গুজার
মোল্লা কফিলউদ্দিন বি. এ. বি. টি.

মোল্লা কফিলউদ্দিন বি. এ. বি. টি.-র চিঠি পড়ে রইসউদ্দিন খুব সাবধানে বুক থেকে একটা স্বস্তির নিশ্বাস বের করে দিলেন। তাঁর নাম রাইচউদ্দিন না (তাঁর ধারণা কারও নাম রাইচউদ্দিন হওয়া সম্ভবও নয়), তাঁর জমিরউদ্দিন নামে কোনো ভাই নেই এবং নয় বছরের কোনো ভাইঝিও নেই। কাজেই এত অল্প বয়সে বাবা-মা মারা-যাওয়া এই বাচ্চা মেয়েটার জন্যে তাঁর একটু দুঃখ লাগলেও তাঁর কিছু করার নেই। সত্যি কথা বলতে কি, এই দুষ্ট মেয়েটা এসে তাঁর ঘাড়ে চেপে বসবে না চিন্তা করেই রইসউদ্দিনের মনটা খুশি হয়ে ওঠে। চিঠিটা ভুল করে তাঁর কাছে চলে এসেছে। পরদিন দুপুরবেলা তিনি পিয়নকে চিঠিটা ফেরত দিয়ে সত্যিকারের রাইচউদ্দিনের কাছে পৌঁছে দিতে বললেন।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, রইসউদ্দিন মোল্লা কফিলউদ্দিনের চিঠির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। তখন আবার তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি এসে হাজির হল। চিঠিতে মোটামুটি একই জিনিস লেখা তবে এবারে শিউলি নামের মেয়েটার কাজকর্মের কিছু বৃত্তান্ত দেওয়া আছে (টুপির মাঝে বিষপিঁপড়া ছেড়ে দেওয়া, মক্তবের মৌলবি সাহেবকে ভূত সেজে ভয় দেখানো, গ্রামের চেয়ারম্যানের নামে কুকুর পোষা, পাড়ার ছেলেপিলে নিয়ে মাঝরাতে গাবগাছে উঠে বসে থাকা ইত্যাদি ইত্যাদি)। পুরো চিঠিটা পড়ে রইসউদ্দিনের শরীর শিউরে উঠল। চিঠির শেষদিকে এবারে মোল্লা কফিলউদ্দিন বি. এ. বি. টি. কিছু-কিছু কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছেন, শুধু তাই নয়, যদি শিউলি নামের মেয়েটাকে এখনই না নিয়ে যান তা হলে কোর্টে কেস করে দেবেন বলে ভয় দেখিয়েছেন।

চিঠি পেয়ে রইসউদ্দিন খুব ঘাবড়ে গেলেন। পরদিন অফিস কামাই করে পিয়নের সাথে কথা বললেন। পিয়ন বলল, চিঠিতে যে-রাইচউদ্দিনের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে সেখানে কেউ থাকে না বলে তাঁকে চিঠিটা দেওয়া হচ্ছে। রইসউদ্দিন তখন নিজেই খোঁজখবর করে প্রকৃত রাইচউদ্দিনকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোনো লাভ হল না। রইসউদ্দিনের ভয় হতে লাগল যে মোল্লা কফিলউদ্দিন বি. এ. বি. টি. হয়তো 'শিউলি' নামের ভয়ংকর মেয়েটাকে নিয়ে নিজেই হাজির হয়ে যাবেন। রাতে তাঁর ভালো

ঘুম হল না, স্বপ্নে দেখলেন শিউলি নামের মেয়েটা মুখে রং মেখে এসে তাঁর গলা চেপে ধরে খিলখিল করে হাসছে আর হাসির শব্দের সাথে সাথে মুখ দিয়ে আগুন আর নাক দিয়ে ধোঁয়া বের হয়ে আসছে। রইসউদ্দিনের খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেল। কী করবেন বুঝতে না পেরে তিনি ছটফট করতে লাগলেন।

এক সপ্তাহ পরে আবার যখন মোল্লা কফিলউদ্দিন বি. এ. বি. টি.-র কাছ থেকে একটা চিঠি এসে হাজির হল তখন রইসউদ্দিনের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। খুব ভয়ে ভয়ে চিঠিটা খুলে পড়লেন, কিন্তু এবারে চিঠির ভাষা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সেখানে লেখা :

ভাই রাইচউদ্দিন,

আমার সালাম নিবেন। পর সমাচার এই যে, আপনাকে এর আগে অনেকগুলি পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিয়াছি সেইজন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। শিউলি একটু দুষ্ট প্রকৃতির মেয়ে তবে একটি বিশেষ কারণে তাহাকে আমার নিকট রাখিব বলিয়া মনস্থির করিয়াছি।

আপনি হয়তো এর কারণ জানিবার জন্য কৌতূহলী হইয়াছেন। অন্য দশজনকে বলিতে দ্বিধা করিতাম, কিন্তু আপনি নিজের মানুষ. আপনাকে বলিতে দ্বিধা নাই। আমাদের গ্রামের একজন মানুষ (তিনি বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি, নাম ফোরকান আলী) সম্প্রতি আমাকে একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন কোনো কোনো মানুষের শরীরে নাকি কিডনি নামক একধরনের বস্তু থাকে, কাহারো একটি কাহারো দুইটি। ইহা শরীরের বিশেষ কোনো কাজে লাগে না কিন্তু বাহিরে অনেক উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব। জনাব ফোরকান আলী শিউলিকে নিয়া শহরে গিয়াছিলেন। শহরের ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন তাহার দুইটি কিডনি রহিয়াছে (আলহামদুলিল্লাহ্) এবং একজন খদ্দের তাহার কিডনি দুইটি ক্রয় করিতে রাজি আছেন। বাজারে আজকাল এই কিডনি দুই হাজার টাকায় বিক্রয় হয় কিন্তু তিনি আমাকে আড়াই হাজার টাকা মূল্য দিতে রাজি হইয়াছেন।

মানুষটি আমাকে জানাইয়াছেন যে, এই কিডনি দুইটি দুইমাসের মাঝে আবার টিকটিকির লেজের মতো গজাইয়া যাইবে এবং ছয় মাসের মাঝে আবার কাটিয়া বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। শিউলিকে এতদিন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়াছি কিন্তু এখন আবিষ্কার করিলাম সে গাভিন গরু বা ফলবতী বৃক্ষ হইতে কোনো অংশে কম অর্থকরী নহে (সোবহান আল্লাহ্)। প্রথমবার বলিয়া কিডনির মূল্য লইয়া দরদাম করিতে পারি নাই। পরের বার বাজার যাচাই করিয়া ঠিক মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত শিউলির কিডনি বিক্রয় করিব না ইনশা আল্লাহ।

আরজ গুজার
মোল্লা কফিলউদ্দিন বি. এ. বি. টি.

পুনশ্চ : আগামী মাসের ছয় তারিখ কিডনি বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে শিউলিকে লইয়া শহরে যাত্রা করিব। দোয়া রাখিবেন।

চিঠি পড়ে রইসউদ্দিনের হার্টফেল করার মতো অবস্থা হল। সব মানুষেরই দুটি কিডনি থাকে এবং অন্তত একটা কিডনি ছাড়া কোনো মানুষই বাঁচতে পারে না। অসুখবিসুখ বা রোগে-শোকে যখন মানুষের দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে যায় তখন শরীরের টিস্যু ইত্যাদি মিলিয়ে অন্য কোনো মানুষের শরীরের একটা কিডনি অপারেশন করে নিজের শরীরে লাগানো যায়, কিন্তু কেটে-ফেলা কিডনি কখনোই টিকটিকির লেজের মতো গজায় না। যারা নিজের কিডনি অন্যকে দিয়ে দেয় তাদের বাকি জীবন একটা কিডনি নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়। সাধারণত খুব আপনজনেরা—যেরকম ভাইবোন বা ছেলেমেয়ে কিডনি দান করে। যদি কিডনি দেওয়ার মতো আপনজন না থাকে তা হলে কখনো কখনো অন্য কারও থেকে কিডনি নেওয়া হয়। অনেক সময় গরিব মানুষেরা টাকার জন্যে নিজের কিডনি বিক্রয় করারও চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপারটি মোল্লা কফিলউদ্দিন যেভাবে বলেছেন মোটেও সেরকম নয়। কিডনি মোটেও টিকটিকির লেজ বা গাছের পেঁপে নয় যে একবার কেটে নিলেও আবার গজিয়ে যাবে! মোল্লা কফিলউদ্দিন হয় নিজেই বড় প্রতারক, নাহয় আরও বড় প্রতারকের খপ্পরে পড়েছেন। তবে সেটা যা-ই হয়ে থাকুক-না কেন তার ফল হিসেবে শিউলি নামের এই দুষ্টু মেয়েটার সব দুষ্টুমি সামনের মাসের ছয় তারিখের মাঝে শেষ হয়ে যাচ্ছে সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

রইসউদ্দিনের খুব মন-খারাপ হল। তিনি ছোট বাচ্চাদের খুব ভয় পান। তারা যদি দুষ্টু হয় তা হলে শুধু যে ভয় পান তাই নয়, তাদের থেকে একশো হাত দূরে থাকেন। কিন্তু এরকম একটা ব্যাপারে তো কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। কী করবেন সেটা নিয়ে রইসউদ্দিন খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন।

রইসউদ্দিন যখন কোনোকিছু নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যান তখন তিনি ব্যাপারটি নিয়ে মাঝে মাঝে মতলুব মিয়ার সাথে কথা বলেন—আজকেও তাই তার সাথে কথা বলতে শুরু করলেন।

মতলুব মিয়া রইসউদ্দিনের কাজকর্মে সাহায্য করার মানুষ, তাঁর সাথে গত পঁচিশ বছর থেকে আছে। সাধারণত যারা খুব বিশ্বাসী এবং কাজের মানুষ তারা একজন আরেকজনের সাথে বিশ-পঁচিশ বৎসর থাকে, কিন্তু মতলুব আলির বেলায় সেটা একেবারে সত্যি নয়। সে অলস এবং নিষ্কর্মা। তার মাথায় কখনো ভালো জিনিস আসে না কিন্তু সারাক্ষণ নানা ধরনের ফিচলে বুদ্ধি কাজ করে। রইসউদ্দিন যখন মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন তখন মতলুব মিয়ার সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। যুদ্ধের নয়টা মাস সে গুলির বাক্স টানাটানি করেছে এবং সারাক্ষণ কোনো-না-কোনো বিষয় নিয়ে কারও-না-কারও কাছে ঘ্যানঘ্যান করেছে। প্রায় রাতেই সে মাথা নেড়ে নেড়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলত, "ধুত্তেরি ছাই! মুক্তিবাহিনীতে না এসে রাজাকারবাহিনীতেই যোগ দেওয়া উচিত ছিল। তা হলে শালার এই প্যাক-কাদার মাঝে গুলির বাক্স টানাটানি করতে হত না।"

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা সবাই যখন অস্ত্র জমা দিচ্ছে তখন মতলুব মিয়া একটা অস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তাকে নাকি কে খবর দিয়েছে যুদ্ধ শেষ হবার পর ডাকাতবাহিনী তৈরি হবে— তাদের কাছে মোটা দামে অস্ত্র বিক্রি করা যাবে। রইসউদ্দিন ধমক দিয়ে তাকে থামিয়েছিলেন। তখন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মতলুব মিয়া রইসউদ্দিনের সাথে ঢাকা চলে এল। রইসউদ্দিন ভেবেছিলেন দেশের যোগাযোগ-ব্যবস্থা ঠিক হওয়ার পর সে বাড়ি যাবে, কিন্তু তার কোনো নিশানা দেখা গেল না। এই 'যাচ্ছি'

'যাব' করে করে সে পঁচিশ বছর কাটিয়ে দিল। রইসউদ্দিন তাকে বাসার কাজকর্ম, বাজারপাতি, রান্নাবান্না এ-ধরনের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন কিন্তু খুব একটা লাভ হয় না। মতলুব আলি আশ্চর্যরকম আলসে এবং নিষ্কর্মা। পৃথিবীর কোনো বিষয়ে তার কোনোরকম কৌতূহল নেই, কোনো আগ্রহ নেই। কোনো ব্যাপারে তাই তার কোনো ধারণাও নেই। দেশে কোন পার্টি ক্ষমতায় আছে বা কে প্রধানমন্ত্রী সেটাও সে ভালো করে জানে বলে মনে হয় না। মানুষ যে বানর থেকে এসেছে মতলুব আলিকে দেখলে ডারউইন সাহেব সেই থিওরিটা আরও দশ বছর আগে দিতে পারতেন।

গভীর কোনো সমস্যা হলে রইসউদ্দিন মতলুব আলির সাথে সেটি নিয়ে আলোচনা করেন। সে তখন এমন অকাট মূর্খের মতো কথা বলে যে, সেগুলো শুনে মাঝেমাঝেই রইসউদ্দিনের মাথায় বিচিত্র সমাধান বের হয়ে আসে। আজকেও রইসউদ্দিন তাকে ডেকে বললেন, "মতলুব মিয়া—"

"জে?"

"তোমাকে শিউলি নামে একটা দুষ্টু মেয়ের কথা বলেছিলাম মনে আছে? ঐ যে তার চাচার কাছে লেখা চিঠিগুলো আমার কাছে চলে আসছিল?"

মতলুব মিয়া মেঝেতে থুতু ফেলে বলল, "জে, মনে আছে। পোস্টঅফিস ডিপার্টমেন্টটাই তুলে দেওয়া উচিত। খালি সময় নষ্ট।"

রইসউদ্দিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে চিঠিপত্র যাবে কেমন করে?"

মতলুব মিয়া উদাস-মুখে বলল, "দরকার কী চিঠিপত্র লেখার? লিখতে সময় নষ্ট, পড়তে সময় নষ্ট। কিছু জানতে হলে টেলিগ্রাম করলেই হয়।"

রইসউদ্দিন কষ্ট করে ধৈর্য ধরে রেখে বললেন, "যা-ই হোক সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না। আমি বলছিলাম কি—"

"বলেন।"

"শিউলি মেয়েটা যে-লোকের সাথে আছে সেই লোক শিউলির কিডনি বিক্রি করার চেষ্টা করছে।"

মতলুব মিয়া মাথা নেড়ে মুখ গম্ভীর করে বলল, "কত করে হালি?"

"কিডনি হালি হিসেবে বিক্রি হয় না। মানুষের কিডনি থাকেই দুটি।"

"তা হলে কত করে জোড়া?"

রইসউদ্দিন মুখ শক্ত করে বললেন, "আমি কিডনির দরদাম নিয়ে কথা বলছি না। এই যে মেয়েটার কিডনি কেটে ফেলছে, মেয়েটা তো বাঁচবে না।"

মতলুব মিয়া নিশ্বাস ফেলে বলল, 'জন্ম-মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে।"

রইসউদ্দিন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী মনে হয়? ব্যাপারটা কি পুলিশকে জানানো উচিত?"

"সব্বোনাশ!" মতলুব মিয়া আঁতকে উঠে বলল, "পুলিশের ধারেকাছে যাওয়া ঠিক না। পুলিশ ছুঁলে আগেই ছিল আঠারো ঘা, এখন একশো ছত্রিশ ঘা।"

রইসউদ্দিন তখন মনে-মনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তার মানে এখন তাঁর পুলিশের কাছেই যাওয়া উচিত। মতলুব মিয়া যেটা বলবে তার উলটোটাই হচ্ছে ঠিক।

রইসউদ্দিন কিন্তু পুলিশের কাছে গিয়ে বিপদে পড়ে গেলেন। যে-লোকটি ফাইলপত্র নিয়ে বসেছিল সে রইসউদ্দিনের কথা শুনতে শুনতে খুব মনোযোগ দিয়ে নাকের লোম ছিঁড়তে লাগল। যখন রইসউদ্দিনের মনে হল তিনি পুরো ব্যাপারটা বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তখন পুলিশের লোকটা হাই তুলে বলল, "তা, কী হয়েছে সমস্যা?"

রইসউদ্দিন একটু থতমত খেয়ে পুরো ব্যাপারটা আবার গোড়া থেকে বুঝিয়ে বললেন। এবার মানুষটা একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কান চুলকাতে লাগল। রইসউদ্দিন মোটামুটি নিশ্চিত ছিলেন মানুষটা এবারেও কোনো কথা শোনেনি, তাঁকে আবার পুরোটা বলতে হবে। কিন্তু দেখা গেল এবারে সে শুনেছে। মাথা নেড়ে বিকট হাই তুলে বলল, "আমি কী করব?"

রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে বাঁচাবেন।'

"মেয়েটার কি কিছু হয়েছে?"

"এখনও হয় নাই কিন্তু হবে।"

"যখন হবে তখন আসবেন।"

"তখন—তখন—" রইসউদ্দিন তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "তখন কি দেরি হয়ে যাবে না?"

মানুষটি হঠাৎ কান চুলকানো বন্ধ করে খুব গম্ভীর মুখ করে বলল, "আমি কি আপনাকে গ্রেপ্তার করেছি?"

রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, "আমাকে? আমাকে কেন গ্রেপ্তার করবেন?'

"যদি আপনি কোনো ক্রাইম করেন সেজন্যে?"

রইসউদ্দিন মুখ হাঁ করে বসে রইলেন আর পুলিশের লোকটি মুখের মাঝে খুব একটা সবজান্তার ভাব করে বলল, "আপনাকে গ্রেপ্তার করি নাই। আপনি ভবিষ্যতে ক্রাইম করবেন সেজন্যে এখন গ্রেপ্তার করা যায় না। ক্রাইমটা আগে করতে হয়। এখানেও সেই এক ব্যাপার। এক লোক ভবিষ্যতে ক্রাইম করবে সেজন্যে তাকে অ্যাডভান্স গ্রেপ্তার করা যায় না। আগে করুক তখন গিয়ে ক্যাঁক করে ধরব। শালার ব্যাটার টাকা-পয়সা কেমন আছে?"

রইসউদ্দিন হতবুদ্ধি হয়ে ফিরে এলেন। মনে হল এই প্রথমবার মতলুব মিয়াই পুলিশের ব্যাপারটা ঠিক বলেছিল। রইসউদ্দিন পরের কয়েকদিন ভালো করে খেতে পারলেন না, ঘুমাতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত একদিন বিকেলে ঠিক করলেন তিনি নিজেই যাবেন মোল্লা কফিলউদ্দিনের সাথে দেখা করার জন্যে। মানুষটাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলে নিশ্চয়ই বুঝবে ব্যাপারটা।

বিকালবেলা রওনা দিলেন ট্রেনে। সারারাত ট্রেনে করে গিয়ে ভোরবেলা উঠলেন বাসে—বাস থেকে নেমে নৌকা এবং সবশেষে পাকা দুই মাইল হেঁটে যখন ঠিক জায়গায় পৌঁছালেন তখন বিকেল হয়ে গেছে। মোল্লা কফিলউদ্দিন বি. এ. বি. টি. গ্রামের মাতবরগোছের মানুষ, তাঁর বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো সমস্যা হল না। রইসউদ্দিন বাড়ির ভিতরে খবর পাঠিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাড়িটি গ্রামের আর দশটা বাড়ির মতো, পুরানো নকশাকাটা চেয়ার, মাটির ভিটে, সামনে টিউবওয়েল, পাশে খড়ের গাদা।

কিছুক্ষণের মাঝেই মোল্লা কফিলউদ্দিন বের হয়ে এলেন। রইসউদ্দিন ঠিক যেরকম একটা চেহারা কল্পনা করেছিলেন তাঁর চেহারা ঠিক সেরকম। লম্বা শেয়ালের মতো মুখ, সেখানে ছাগলের মতো দাড়ি, শুকনো দড়ির মতো শরীর, কোটরাগত চোখ, মাথায় ময়লা তেল-চিটচিটে টুপি, পরনে রং-ওঠা নীল পাঞ্জাবি আর খাটো লুঙ্গি। রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে খুব সন্দেহের চোখে বললেন, "আপনার কী দরকার?"

রইসউদ্দিন পকেট থেকে তাঁর লেখা চিঠিগুলো বের করে বললেন, "আপনি এই চিঠিগুলো লিখেছিলেন?"

মোল্লা কফিলউদ্দিন হঠাৎ কেমন জানি শক্ত হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ ভুরু কুঁচকে রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং এ-সময়টাতে তাঁকে কেমন জানি ছুঁচোর মতো দেখাতে থাকে। রইসউদ্দিন বললেন, "আপনি লিখেছেন শিউলির কিডনি বিক্রি করবেন। কিন্তু—"

"আপনি কি শিউলির চাচা?"

"আমি কে সেটা ইম্পরট্যান্ট না।"

"তা হলে কোনটা ইম্পরট্যান্ট?"

"মানুষের কিডনি আলু-পটল না যে বাজারে বিক্রি করবেন—সেইটা ইম্পরট্যান্ট। আপনি লিখেছেন কিডনি কাটলে সেটা আবার টিকটিকির লেজের মতন গজায়— সেটা ঠিক না। আপনাকে যে এটা বুঝিয়েছে সে-ব্যাটা মহা বদমাইশ। সত্যি সত্যি যদি দুটো কিডনিই কেটে ফেলা হয় মেয়েটা মারা পড়বে। শুধু তাই না, আপনারও ফাঁসি হয়ে যাবে।"

মোল্লা কফিলউদ্দিন পিটপিট করে রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। রইসউদ্দিন বললেন, "কী হল, আপনি কিছু বলছেন না কেন?"

"আপনি লেকচার দিতে এসেছেন লেকচার দিয়ে চলে যান, আমি কী বলব?"

মোল্লা কফিলউদ্দিনের কথা শুনে হঠাৎ রইসউদ্দিনের রাগ উঠে গেল। মেঘের মতো গর্জন করে বললেন, "আমি লেকচার দিতে আসি নাই। আমি একটা মেয়ের জান বাঁচাতে এসেছি।"

মোল্লা কফিলউদ্দিন পিচিক করে দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুতু ফেলে বললেন, "সেই মেয়ের জন্যে দরদ এতদিন পরে উথলে উঠল কেন? এতদিন থেকে যে আমার কাছে থাকে খায় তখন কেউ খোঁজ নেয় নাই কেন?"

"কেউ খোঁজ পায় নাই তাই খোঁজ নেয় নাই।"

"এখন কিসের খোঁজ পেয়ে আপনি এসেছেন সেইটা আমি বুঝি নাই মনে করেছেন? আমার বয়স তো কম হয় নাই, আমি মানুষ চিনি।"

মোল্লা কফিলউদ্দিন পাঞ্জাবির হাতায় ফ্যাঁৎ করে নাক ঝেড়ে বললেন, "তবে আপনি দেরি করে ফেলেছেন।"

"দেরি?"

"হ্যাঁ। আবাগীর বেটি শিউলি পালিয়ে গেছে।"

"পালিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

রইসউদ্দিন হতবাক হয়ে মোল্লা কফিলউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষটা যে মিথ্যে কথা বলছে সেটা বুঝতে তাঁর একটুও দেরি হল না। মাথা নেড়ে বললেন, "এতটুকুন মেয়ে পালিয়ে কোথায় যাবে?"

"সেটা আমি কী জানি? আর ঐ মেয়ে এইটুকুন হলে কী হবে, বেটি বজ্জাতের ঝাড়!"

রইসউদ্দিন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। মোল্লা কফিলউদ্দিনের দাড়ি ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বলার ইচ্ছে করল, ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার, মিথ্যে বলবি তো মাথা ভেঙে ফেলব। কিন্তু সেটা তো আর সত্যি সত্যি বলা যায় না, তাই গলার স্বর শান্ত রেখে বললেন, "আপনার নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। বাড়িতে নিশ্চয়ই কোথাও আছে, খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন।"

"কী? আমি মিথ্যে কথা বলছি?" মোল্লা কফিলউদ্দিন হুংকার দিয়ে বললেন, "আপনার কত বড় সাহস, আমার বাড়িতে এসে আমাকে মিথ্যেবাদী বলেন?"

"আমি মিথ্যেবাদী বলি নাই। আমি বলছি—"

"আপনি কী বলেছেন আমার শোনার দরকার নাই।" কফিলউদ্দিন মাটিতে থুতু ফেলে বললেন, "বাপ-খাগি মা-খাগি আবাগীর বেটি ছয় মাস আমার বাড়িতে আছে, কারও খোঁজ নাই, এখন আসছেন দরদ দেখাতে? ঐ ছেমড়ি গেছে জাহান্নামে, তারে খুঁজতে হলে আপনি জাহান্নামে যান।"

রইসউদ্দিন দাঁত-কিড়মিড় করে বললেন, "দেখেন মোল্লা কফিলউদ্দিন সাহেব, আমি কোথায় যাব সেটা আমিই ঠিক করব। তবে এই মেয়ের যদি কিছু হয় তা হলে আপনি শুনে রাখেন—"

"কী শুনে রাখব?"

"আপনার গলায় ফাঁসির দড়ি লাগানোর সব প্রমাণ আমার কাছে আছে।"

কফিলউদ্দিন কুতকুতে চোখে রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন আর রইসউদ্দিন রেগেমেগে সেখান থেকে বের হয়ে এলেন। গ্রামের পথে আবার দুই মাইল হেঁটে নৌকায় উঠলেন, নৌকা করে ঘণ্টাদুয়েক গিয়ে বাস, বাসে ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর ট্রেন। সারাদিনে দুটো ট্রেন। সকালেরটা চলে গেছে, পরের ট্রেন রাত নয়টায়, এখনও ঘণ্টাদুয়েক বাকি।

রইসউদ্দিন স্টেশনের কাছে একটা রেস্টুরেন্টে ভাত খেয়ে রেল-স্টেশনের বেঞ্চে বসে রইলেন। শিউলি নামের এই বাচ্চা মেয়েটাকে কীভাবে পিশাচ মোল্লা কফিলউদ্দিনের হাত থেকে বাঁচানো যায় সেটা ভাবছিলেন। দেশ তো এখনও মগের মুল্লুক হয়ে যায়নি, নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো উপায় আছে। এমনিতে থানা-পুলিশ যদি উৎসাহ না দেখায়, নারী সংগঠন, শিশু সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন—এসব বড় বড় জায়গায় যাওয়া যাবে। তাঁর কাছে কফিলউদ্দিনের নিজের হাতে লেখা তিন-তিনটে চিঠি আছে। কাউকে বিশ্বাস করানো কোনো ব্যাপারই না।

কী করা যায় ভেবে ভেবে রইসউদ্দিনের যখন প্রায় মাথা-গরম হয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ মনে হল কেউ-একজন যেন তাঁর শার্টের কোনা ধরে টানছে। রইসউদ্দিন মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন আট-নয় বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে। রইসউদ্দিন বাচ্চাকাচ্চাকে খুব ভয় পান তাই একেবারে চমকে উঠলেন। কাঁপা গলায় বললেন, "কে?"

মেয়েটা দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমি শিউলি।"

২

রইসউদ্দিন যখন মোল্লা কফিলউদ্দিনের সাথে কথা বলছিলেন তখন বাঁশের বেড়ার অন্য পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিউলি তাঁদের কথাবার্তা শুনছিল। পাগল ধরনের একটা মানুষ তাকে বাঁচানোর জন্যে সেই কোথা থেকে এখানে চলে এসেছে চিন্তা করে শিউলির চোখে পানি এসে গেল। শিউলি চোখ মুছে বাঁশের বেড়ার ফোকর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনতে পেল কফিলউদ্দিন বলছেন যে সে পালিয়ে গেছে। তারপর শুনল যে সে নাকি বজ্জাতের ঝাড়, বাপ-খাগি, মা-খাগি আবাগীর বেটি। শুনে হঠাৎ শিউলির মাথায় রক্ত উঠে গেল। ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে কফিলউদ্দিনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নখ দিয়ে মুখ আঁচড়ে দেয়।

কিন্তু সে কিছুই করল না। গত ছয় মাসে সে যেসব জিনিস শিখেছে তার মাঝে এক নম্বর হচ্ছে যে, সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। মাথা-গরম করে কোনোকিছুই করা যায় না, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে সবকিছু করা যায়।

যেমন ধরা যাক বিড়ালের দুধ খাওয়ার ঘটনাটা। মাসখানেক আগে এক সন্ধেবেলা দেখা গেল রান্নাঘরে বিড়াল এসে দুধ খেয়ে, দুধের ডেকচি উলটে সব দুধ ফেলে গেছে। হালকা-পাতলা কফিলউদ্দিনের পাহাড়ের মতো স্ত্রী এসে শিউলির ঘাড়ে ধরে গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, "হারামজাদি, চোখের মাথা খেয়ে ফেলেছিস নাকি? পাকঘরের দরজা খুলে রাখলি যে?"

শিউলি বলল, "চাচি, আমি খোলা রাখি নাই।"

পাহাড়ের মতো বিশাল মহিলা তাঁর শরীর ঝাঁকিয়ে ছুটে এসে শিউলির পিঠে গুমগুম করে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিয়ে বললেন, "আবাগীর বেটি—আমার মুখের উপরে কথা!"

শিউলি তাই কোনো কথা বলল না। তার নিজের আম্মার কথা মনে পড়ে চোখ ফেটে পানি এসে যাচ্ছিল, কিন্তু সে একটুও কাঁদল না। চাচির দিকে তাকিয়ে মনে-মনে বলল, "দেখা যাবে কে আবাগীর বেটি! আমি তোমারে এমন শিক্ষা দেব চাচি তুমি জন্মের মতো সিধা হয়ে যাবে।"

চাচিকে কীভাবে শাস্তি দেওয়া যায় শিউলি তখন সেইটা নিয়ে কয়েকদিন চিন্তা করল। যেহেতু চাচি ছোটখাটো পাহাড়ের মতো বিশাল তাই তার উচিত শাস্তি হবে যদি তাকে খানিকক্ষণ দৌড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো যায়। একজন মোটা মানুষ নিজে থেকে কখনো দৌড়াবে না, তাকে দৌড়ানোর উপায় হচ্ছে ভয় দেখানো। চাচি সবচেয়ে যে-জিনিসটাকে ভয় পান সেটা হচ্ছে মাকড়শা। ঘরে যদি ছোট একটা মাকড়শাও থাকে তা হলে চাচি চিৎকার হৈচৈ শুরু করে দেন যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ-একজন এসে সেটাকে ঝাঁটাপেটা করে ঘরছাড়া না করছে। কাজেই শিউলি ঠিক করল চাচিকে আর একটা বিশাল গোবদা মাকড়শাকে এক জায়গায় রাখতে হবে। সেই জায়গাটি কী হতে পারে সেটা নিয়ে কয়েকদিন চিন্তা করে শিউলির মনে হল যে সবচেয়ে ভালো হয় যদি মাকড়শাটাকে তাঁর মশারির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। মশারির ভেতরে মাকড়শাটা ছুটে বেড়াবে। চাচি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মশারি ছিঁড়ে নিচে এসে পড়বে, সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হবে। তখন তাঁর উচিত শিক্ষা হবে।

এই পুরো ব্যাপারটার একমাত্র কঠিন অংশটুকু হচ্ছে মশারির ভেতরে মাকড়শাটাকে ঢোকানো। লুকিয়ে একটা মাকড়শা ছেড়ে দিলে লাভ নেই—চাচি হয়তো খেয়ালও করবে না। মাকড়শাটাকে ছাড়তে হবে তাঁকে দেখিয়ে একেবারে তার চোখের সামনে।

আরও দুইদিন চিন্তা করে শিউলি ঠিক করল ব্যাপারটা কী করে করা হবে। শিউলি লক্ষ করেছে চাচি ঘুমানোর আগে প্রতিদিন তাঁর পানের বাটা নিয়ে মশারির ভেতরে ঢোকেন। বিছানায় বসে বসে চাচি জর্দা দিয়ে দুই খিলি পান খেতে খেতে কফিল চাচার সাথে দুনিয়ার বিষয় নিয়ে ঝগড়া করেন। মাকড়শাটা রাখতে হবে পানের বাটার ভেতরে। চাচি যেই পানের বাটা খুলবেন গোবদা মাকড়শাটা তিরতির করে চাচির হাত বেয়ে উঠে আসবে—এর পরে আর কিছু দেখতে হবে না।

ভালো দেখে স্বাস্থ্যবান একটা মাকড়শা খুঁজে সেটাকে ধরে একটা কৌটার মাঝে রাখতে শিউলির কয়েকদিন লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত যেদিন ঠিক ঘুমানোর আগে মাকড়শাটাকে কৌটা থেকে পানের বাটার মাঝে ঢুকিয়ে সেটাকে ঢাকনাটা দিয়ে আটকে

দিতে পারল সেদিন শিউলির বুক উত্তেজনায় একেবারে ঢিবঢিব করতে লাগল। রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে উঁকি মেরে দেখল চাচি পানের বাটা হাতে বিছানায় ঢুকলেন, মশারিটা ভালো করে গুঁজে দিতে দিতে কফিল চাচার সাথে ঝগড়া শুরু করলেন। দুজন ঝগড়া করতে করতে উঠে বসলেন এবং চাচি তাঁর দুই খিলি পান তৈরি করার জন্যে পানের বাটা খুললেন। তারপর যা একটা ব্যাপার ঘটল তার কোনো তুলনা নেই।

বিশাল গোবদা মাকড়শাটা আট পায়ে চাচির হাত বেয়ে তিরতির করে উঠে এল। চাচি ঠিকই চিৎকার করে তাঁর সেই দেহ নিয়ে লাফিয়ে উঠে মাকড়শাটাকে ছুড়ে ফেলার চেষ্টা করলেন। মাকড়শাটা ভয় পেয়ে তাঁর শাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। তখন চাচি দুই হাত দুই পা ছুড়ে বিছানায় লাফাতে লাফাতে তাঁর শাড়ির ভেতরে এখানে সেখানে হাত ঢুকিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। শাড়ি তাঁর পায়ে পেঁচিয়ে গেল, তিনি তাল সামলাতে না পেরে দড়াম করে কফিল চাচার ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। চাচির পাহাড়ের মতো শরীরের ভারে কফিল চাচার মনে হল তাঁর শরীরের সব কয়টা হাড় ভেঙে গেল । তিনি একেবারে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলেন। দুজন তখন মশারিতে জড়িয়ে মশারির দড়ি ছিঁড়ে বিছানা থেকে নিচে এসে পড়লেন। সেই অবস্থাতে মাকড়শাটা চাচির শরীরের উপর দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল এবং চাচি সেই অবস্থায় কফিল চাচাকে মশারিতে পেঁচিয়ে তাঁকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে মশারিসহ ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে একেবারে কয়েক লাফে বারান্দা পার হয়ে উঠানে হাজির হলেন।

সবাই ভাবল ঘরে ডাকাত পড়েছে, তারা লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এল। চাচি আর কফিল চাচাকে এই অবস্থায় দেখে ব্যাপারটা কী বুঝতেই অনেকক্ষণ লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত চাচি মশারি ছিঁড়ে বের হয়ে এলেন। শাড়ি খুলে শুধু পেটিকোট, ব্লাউজ পরে তাঁর দৌড়াদৌড়ি যা একটা মজার দৃশ্য হল সে আর বলার মতো নয়।

অনেকদিন পর শিউলির সেই রাত্রে খুব আরামের একটা ঘুম হয়েছিল। এতদিন পরে কফিল চাচার কথা শুনে শিউলি বুঝতে পারল তাঁকেও একটা কঠিন শাস্তি দেবার সময় হয়েছে। খুব ভালো করে শাস্তি দিতে হলে চিন্তা-ভাবনা করে ঠাণ্ডা মাথায় একটা বুদ্ধি বের করতে হয়। কিন্তু এখন সেরকম চিন্তা-ভাবনা করার সময় কোথায়? কফিল চাচা যখন বলেছে সে পালিয়ে গেছে—কাজেই সে পালিয়েই যাবে। তবে পালিয়ে যাবার আগে কফিল চাচাকে একটা ভালো শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে। আগের বার তাকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হয়েছে যেন কেউ তাকে ধরতে না পারে। এবার তাকে ধরতে পারলেও ক্ষতি নেই। শিউলি বাড়ির পেছনে কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করে মোটামুটি একটা বুদ্ধি বের করে ফেলল।

মাত্র অল্প কয়দিন আগে সে সুপার গ্লু জিনিসটা আবিষ্কার করেছে। চাচির প্রিয় একটা কাপের হ্যান্ডেলটা ভেঙে গিয়েছিল তখন শহর থেকে এই সুপার গ্লু আনা হয়েছে। এক ফোঁটা সুপার গ্লু ব্যবহার করে হ্যান্ডেলটা ম্যাজিকের মতো লাগিয়ে ফেলেছিল, দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে এটা কখনো ভেঙেছে। মজার ব্যাপার হল হ্যান্ডেলটা লাগানোর সময় হাতে একটু গ্লু লেগে গিয়েছিল। সেই গ্লু এমনই শক্তভাবে লেগেছে যে আর তোলার উপায় নেই! মানুষের চামড়ার সাথে জিনিস জুড়ে দেবার মতো এরকম জিনিস মনে হয় পৃথিবীতে আর একটাও নেই। শিউলি ঠিক করল এই সুপার গ্লু দিয়েই সে তার কফিল চাচাকে শাস্তি দেবে। কোনো-একটা জিনিস সে কফিল চাচার শরীরের

সাথে পাকাপাকিভাবে লাগিয়ে দেবে। সবচেয়ে ভালো হত যদি দুইটা ঠোঁট একসাথে লাগিয়ে দিতে পারত, তা হলে জন্মের মতো তাকে গালাগালি করা বন্ধ হয়ে যেত, কিন্তু সেটা তো আর এখন সম্ভব নয়। যদি খুব ঠাণ্ডা মাথায় কয়েকদিন চিন্তা করার সুযোগ পেত তা হলে সে নিশ্চয়ই একটা বুদ্ধি বের করে ফেলত। কিন্তু তার হাতে মেটেই সময় নেই। যেটাই সে করতে চায় করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।

প্রথমে তার একটা কাগজ দরকার যেখানে কিছু লেখা আছে। এ-বাড়িতে লেখাপড়ার বিশেষ চল নেই। খুঁজেপেতে একটা লেখা-কাগজ বের করতে তার অনেকক্ষণ সময় লেগে গেল। বাড়িতে কোথাও ছিল না বলে রান্নাঘরের ভালের ঠোঙা থেকে ছিঁড়ে বের করতে হল। কাগজটা হাতে নিয়ে সে পা টিপে টিপে বড় ঘরে ঢুকল। কফিল চাচার চশমাটা থাকে একটা টেবিলের উপরে, সুপার গ্লুটা থাকে জানালার তাকে। সুপার গ্লুটা হাতে নিয়ে সে কফিল চাচার চশমার দুই ডাঁটিতে দুই ফোঁটা আর চশমার যে-অংশটা নাকের উপর চেপে বসে থাকে সেখানে দুই ফোঁটা লাগিয়ে নিল। তারপর চশমাটা যেখানে থাকার কথা সেখানে রেখে কফিল চাচাকে খুঁজে বের করল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি কাকে জানি গালিগালাজ করছিলেন। শিউলি কফিল চাচার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "চাচা!"

কফিল চাচা খেঁকিয়ে উঠে বললেন, "কী হয়েছে?"

"পুলিশ।"

এই কথাটায় অবিশ্যি ম্যাজিকের মতো কাজ হল। চোখ কপালে তুলে বললেন, "কোথায়?"

"এই বাইরে ছিল এখন অন্যদিকে হেঁটে গেছে। আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিল।"

"আমার কথা?" কফিলউদ্দিনকে হঠাৎ কেমন জানি ফ্যাকাশে দেখায়। "আমার কথা কী জিজ্ঞেস করেছে?"

"আপনি কখন বাসায় থাকেন কী করেন এইসব। ছেলেধরার সাথে যোগাযোগ আছে কি না সেটাও জিজ্ঞেস করেছে।"

কফিলউদ্দিন কেমন যেন চিমশে মেরে গেলেন। শিউলি বলল, "পুলিশের হাতে অনেক কাগজ ছিল। সেখান থেকে এই কাগজটা নিচে পড়ে গিয়েছিল। পুলিশ টের পায় নাই, আমি তুলে এনেছি।"

"দেখি দেখি—" বলে কফিল চাচা শিউলির হাতের কাগজটা প্রায় ছোঁ মেরে নিলেন। চশমা ছাড়া কিছু পড়তে পারেন না তাই ধড়ম ধটখট করে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর থেকে চশমাটা নিয়ে নাকের ডগায় চাপিয়ে নিয়ে কাগজটা পড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

শিউলির বুক টিপটিপ করতে শুরু করল। সুপার গ্লু খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে, আর কিছুক্ষণ চশমাটা নাকের ডগায় রাখতে পারলেই হবে। শিউলি ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করল, "কী লেখা আছে কাগজে?"

"বুঝতে পারলাম না। দেখে মনে হয় ইংরেজি ট্রান্সলেশন। আমি গরুকে খাওয়াই—আই ইট কাউ।"

"তাই লেখা?"

"হুম।"

"অন্য পৃষ্ঠায় কী লেখা?"

কফিল চাচা অন্য পৃষ্ঠায় কী লেখা সেটা পড়তে শুরু করলেন। খানিকটা পড়ে শিউলির দিকে তাকালেন, "তুই সত্যি এই কাগজটা পেয়েছিস?"

"হ্যাঁ, এটাই।"

কফিলউদ্দিন আবার কাগজটা পড়লেন, পড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। শিউলি জিজ্ঞেস করল, "কী লেখা আছে চাচা?"

"এখানে লেখা, একটি বাঁদর একটি তৈলাক্ত বাঁশ বাহিয়া উপরে উঠিতেছে। প্রতি মিনিটে দুই ফুট উপরে উঠিয়া পরের মিনিটে—" কফিল চাচা এবার কড়াচোখে শিউলির দিকে তাকালেন, "তুই সত্যি এইটা পেয়েছিস?"

শিউলি মাথা চুলকাল, "এইটাই তো মনে হল।"

কফিলউদ্দিন আবার কাগজটা পড়তে শুরু করলেন। উপর থেকে নিচে— নিচে থেকে উপরে, ডান থেকে বামে—বাম থেকে ডানে এবং শিউলি তখন সটকে পড়ল। তাঁর কাজ শেষ, এখন তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবার সময়। কিন্তু তার কাজটা কেমন হয়েছে না দেখে সে কেমন করে যায়?

কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ সে বাড়ির ভেতর থেকে বিকট চিৎকার শুনতে পেল, মনে হল কফিল চাচা ডাক ছেড়ে একটা আর্তনাদ দিয়েছেন।

বাইরে যেসব বাচ্চাকাচ্চা খেলছিল তাদের পিছুপিছু শিউলিও বাড়ির ভেতরে এসে ঢুকল। দেখতে পেল উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কফিল চাচা তাঁর চশমাটা খোলার চেষ্টা করছেন এবং খুলতে না পেরে একটু পরেপরে একটা বিকট আর্তনাদ দিচ্ছেন। পাহাড়ের মতো মোটা শরীর নিয়ে চাচিও হাজির হলেন, মুখ-ঝামটা দিয়ে বললেন, "এইরকম করে চ্যাঁচাচ্ছেন কেন?"

"চশমা!"

"চশমা কী হয়েছে?"

"খোলা যাচ্ছে না।"

"খোলা যাচ্ছে না! ঢং নাকি?" এই বলে চাচি চশমা ধরে একটা টান দিলেন এবং কফিল চাচা একেবারে গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দিলেন। দেখা গেল সত্যি চশমা খোলা যাচ্ছে না এবং হঠাৎ করে চাচির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

"মাথাটা নিচু করেন দেখি।"

কফিল চাচা মাথাটা কচ্ছপের মতো নিচু করলেন। চাচি খুব ভালো করে পরীক্ষা করে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। কফিল চাচা শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"মনে হচ্ছে চামড়ার সাথে আটকে গেছে।"

কফিল চাচা কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, "আটকে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"সেটা কেমন করে হয়?"

আশেপাশে যারা ছিল তারা সবাই তখন কফিল চাচার চশমা পরীক্ষা করতে শুরু করে, সবাই একটু করে টানাটানি করে আর প্রত্যেকবারই কফিল চাচা বিকট একটা করে আর্তনাদ করে ওঠেন। কফিল চাচার ফুপাতো ভাই—বাজারের জামে মসজিদের পেশ ইমাম, খানিকক্ষণ টানাটানি করে বললেন, "মনে হয় কেটে খুলতে হবে।"

"কেটে?" কফিল চাচা আর্তনাদ করে বললেন, "নাক-কান কেটে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

চাচি ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কিন্তু এটা হল কেমন করে?"

কফিল চাচার ফুপাতো ভাই দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, "হয়।"

"হয়?"

"হ্যাঁ। বা'জানের কাছে শুনেছি একবার কবরে লাশ নামাতে গিয়ে একজন কবর থেকে উঠতে পারে না। পা মাটির সাথে লেগে গেছে। একেবারে এইরকম—এখন চশমা নাকের সাথে লেগে গেছে।"

"কিন্তু কারণটা কী?"

"গজব।"

কফিল চাচা ভাঙা গলায় বললেন, "গজব?"

"হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র গজব। আল্লাহ্‌র হক আদায় না করলে গজব হয়। এতিমের হক আদায় না করলেও হয়। তওবা করো, দান-খয়রাত করো। এতিমের হক আদায় করো—"

শিউলি বুঝল এখন তার পালিয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে। সবাই যখন নাকের উপর চশমা এঁটে বসার কারণটা বের করার চেষ্টা করছে, টানাটানি করে সেটা খোলার চেষ্টা করছে তখন পেছন থেকে শিউলি সটকে পড়ল। যেতে যেতে শুনল কফিল চাচা একটু পরেপরে বিকট গলায় চিৎকার করছেন।

গ্রামের পথে দুই মাইল হেঁটে, নৌকায় নদী পার হয়ে শেষ অংশটুকু বাসে গিয়ে শিউলি শেষ পর্যন্ত স্টেশনে পৌঁছাল। ট্রেন চলে গেলে সে খুব বিপদে পড়ে যেত, কিন্তু কফিলউদ্দিনের বাড়িতে থাকলে তার যে বিপদ হতে পারে তার তুলনায় এই বিপদটি কিছুই না।

স্টেশনে খোঁজাখুঁজি করতেই সে পাগল ধরনের মানুষটিকে পেয়ে গেল—একটা বেঞ্চে বসে কিছু-একটা খুব মনোযোগ দিয়ে ভাবছে। একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর পরেও যখন মানুষটি তাকে দেখল না তখন সে তাঁর শার্টের কোনা ধরে টানল, মানুষটা তখন কেমন জানি একেবারে ভূত দেখার মতো চমকে উঠে বলল, "কে?"

শিউলি জোর করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমি শিউলি।"

ঝিক ঝিক করে ট্রেন যাচ্ছে, জানালার কাছে শিউলি বসে বাইরে তাকিয়ে আছে। তার এক হাতে একটা পেপসির বোতল আর অন্য হাতে একটা আপেল। আপেলটাতে ঘ্যাঁচ করে একটা কামড় বসিয়ে দিয়ে সেটা কচকচ করে খেতে খেতে শিউলি বলল, "এই বিলাতি পেয়ারাটা খেতে কী মজা দেখেছ?"

রইসউদ্দিন বললেন, "এটার নাম আপেল।"

"আপেল? এটাকে বলে আপেল?"

শিউলি হাতের আধখাওয়া আপেলটার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি ভেবেছিলাম আপেল আরও ছোট হয়, বড়ইয়ের মতন।"

শিউলি ঘ্যাঁচ করে আরও একটা কামড় দিয়ে আবার কচকচ করে আপেল খেতে খেতে হাতের পেপসিটাকে দেখিয়ে বলল, "এইটাকে কী বলে?"

"এটার নাম পেপসি।"

"পেপসি?"

শিউলি হিহি করে হাসতে হাসতে বলল, "ধরছি, মারছি, খাইছি, পেপসি! হি হি হি!"

শিউলি অকারণে হাসতে থাকে এবং রইসউদ্দিন একটা বিচিত্র আতঙ্ক নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। যে-ছোট মেয়েটার জীবন বাঁচানোর জন্যে তিনি মোটামুটি

পাগলের মতো ছুটে গেছেন, গত কয়েক ঘন্টায় আবিষ্কার করেছেন, তার জীবন নেবার জন্যে স্বয়ং আজরাইল এলেও সে মনে হয় তাঁকে খোল খাইয়ে ফিরিয়ে দেবে। এত ছোট একটা মেয়ে কেমন করে এরকম চালাক-চতুর এবং ভয়ংকর হয় রইসউদ্দিন কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। সবচেয়ে যেটা ভয়ের ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই ভয়ংকর বাচ্চাটিকে তিনি নিজের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন— এটা যদি আত্মহত্যা না হয় তা হলে আত্মহত্যা কাকে বলে?

শিউলি পেপসির বোতল থেকে বড় এক চুমুক পেপসি নিয়ে মুখে সেটা কুলকুচা করে খানিকটা পিচিক করে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ অকারণে আবার হিহি করে হেসে উঠল। রইসউদ্দিন শুকনো-মুখে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, "তুমি যে আমার সাথে চলে আসছ তোমার ভয় করছে না?"

শিউলি মাথা নাড়ল, "করছে।"

"তা হলে?"

"কফিল চাচার কাছে থাকলে ভয় আরও বেশি হত। মনে নাই কফিল চাচা কেটেকুটে আমার কলিজা বিক্রি করতে যাচ্ছিল?"

"কলিজা না, কিডনি।"

"এক কথা।"

শিউলি পেপসির বোতলে আরেকটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, "কফিল চাচাকে একেবারে উচিত শাস্তি দিয়ে এসেছি। একেবারে টাইট করে দিয়ে আসছি।"

রইসউদ্দিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী শাস্তি দিয়েছ?"

শিউলি তখন পেপসির বোতলে চুমুক দিতে দিতে কফিলউদ্দিনের নাকের ডগায় কীভাবে পাকাপাকিভাবে তাঁর চশমাটা সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে দিয়ে এসেছে সেটা বর্ণনা করল এবং বলতে বলতে হাসির চোটে একসময় তার নাক দিয়ে খানিকটা পেপসি বের হয়ে এল।

শিউলির বর্ণনা শুনে রইসউদ্দিনের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তিনি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শিউলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। খানিকক্ষণ পর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে শুকনো গলায় বললেন, "তু-তু-তুমি কি মাঝে মাঝেই মানুষকে শাস্তি দাও?"

শিউলি মাথা নাড়ল, "দেই।"

"কেন দাও?"

"রাগ উঠে যায় সেইজন্যে দেই।"

"রা-রাগ উঠে যায়?"

"হ্যাঁ। কেউ বদমাইশি করলেই আমার রাগ উঠে যায়। চাচি যেইবার খামোকা আমাকে মারল সেইবারও আমার রাগ উঠে গিয়েছিল। তারেও শাস্তি দিয়েছিলাম।"

"কী শাস্তি দিয়েছিলে?"

শিউলি ঘটনাটা বর্ণনা করার আগেই হাসতে হাসতে একবার বিষম খেয়ে ফেলল। পুরো ঘটনাটা তার মুখে শোনার পর হঠাৎ করে রইসউদ্দিনের মনে হতে লাগল তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে চিঁচি করে বলেন, "তোমার আসলেই কোনো আত্মীয়স্বজন নেই?"

"আছে। আমার ছোট চাচা আছে।"

"কে? ঐ যে রাইচউদ্দিন?"

শিউলি তার পেপসির শেষ ফোঁটাটা খুব তৃপ্তির সাথে শেষ করে বলল, "না, ঐটা বানানো। কফিল চাচাকে শান্ত রাখার জন্যে বলেছিলাম। আমার আসল চাচা আমেরিকা থাকে।"

"কী নাম?"

"রঞ্জু।"

"পুরো নাম কী?"

শিউলি খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলল, "পুরো নাম তো জানি না।"

"কী করেন তোমার চাচা?"

"আমাকে পিঠে নিয়ে দৌড়ান, পেটে কাতুকুতু দেন।"

রইসউদ্দিন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আর কী করেন? কোথায় কাজ করেন?"

"সেটা তো জানি না।"

শিউলির মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "খুব সুন্দর চেহারা রঞ্জু চাচার, একেবারে সিনেমার নায়কদের মতো।"

"আমেরিকায় কোথায় থাকেন জান?'

"না, জানি না।"

শিউলি হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। এই দুষ্টু মেয়েটার চেহারায় সবকিছু মানিয়ে যায়, গাম্ভীর্যটা একেবারেই মানায় না। সেই বেমানান চেহারায় বলল, "রঞ্জু চাচা আমাকে খুব আদর করেন। যদি শুধু খবর পান তা হলেই আমেরিকা থেকে এসে নিয়ে যাবেন।"

রইসউদ্দিন চুপ করে রইলেন। শিউলি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কি আমেরিকায় রঞ্জু চাচাকে খবর পাঠাতে পারবে?"

রইসউদ্দিন শিউলির দিকে তাকালেন, নায়কের মতো চেহারার একজন মানুষ, যে শিউলিকে কাঁধে নিয়ে দৌড়ায়, পেটে কাতুকুতু দেয়, যার সম্পর্কে একমাত্র তথ্য যে তার নাম রঞ্জু— তাকে আমেরিকার পঁচিশ কোটি মানুষের মাঝে থেকে খুঁজে বের করে শিউলির খবরটা পৌঁছাতে হবে। রইসউদ্দিন কী বলবেন বুঝতে পারলেন না, কিন্তু শিউলির চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মায়া হল, তিনি নরম গলায় বললেন, "পারব শিউলি। তুমি চিন্তা কোরো না, আমি তোমার চাচাকে খবর পাঠাব।"

৩

খেতে বসে প্লেটের দিকে তাকিয়ে শিউলি বলল, "এটা কী?"

মতলুব মিয়া ভান করল যেন সে প্রশ্নটা শুনতে পায়নি। শিউলি প্লেটের সাদামতন আঠা-আঠা জিনিসটায় হাত দিয়ে আরেকবার নেড়ে হাত গুটিয়ে নিয়ে বলল, "এটা কী না বললে আমি খাব না।"

মতলুব মিয়া মুখ শক্ত করে বলল, "ঢং কোরো না। এইটা ভাত।"

"ভাত?"

শিউলি প্লেটটা ধরে উলটো করে ফেলল, দেখা গেল সাদামতন আঠালো জিনিসটা পড়ল না, প্লেটে আটকে রইল। আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে বলল, "এইটা ভাত না। ভাত এভাবে আটকে থাকে না, নিচে পড়ে যায়।"

"ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা—বুঝলাম। ভাতটা একটু গলে গেছে।"

"ভাত এভাবে গলে না । যদি এভাবে গলে সেটা ভাত থাকে না।"

টেবিলের অন্যপাশে বসে রইসউদ্দিন খুব মনোযোগ দিয়ে শিউলি এবং মতলুব মিয়ার কথাবার্তা শুনছিলেন। তাঁর প্লেটেও ভাত নামের এই সাদা আঠা-আঠা জিনিসটা রয়েছে। তিনি জিনিসটা একটু নেড়েও দেখেছেন। মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু তাঁর কোনো উপায় আছে বলে মনে হচ্ছিল না। গত পঁচিশ বছর থেকে মতলুব মিয়া তাঁকে এরকম কুৎসিত জিনিস খাইয়ে আসছে। খাবার যে ভালোমন্দ হতে পারে, তার মাঝে যে উপভোগের একটা ব্যাপার আছে সেটা তিনি জানেনই না।

শিউলি সামনে বাটিতে রাখা খানিকটা মাছের ঝোলের দিকে দেখিয়ে বলল, "এটা কী?"

মতলুব মিয়া কঠিনমুখে বলল, "মাছের তরকারি।"

"মাছ রান্না করার আগে মাছকে কুটতে হয়, পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করতে হয়—এটা দেখি এমনি রেঁধে ফেলেছ। ওয়াক, থুঃ!"

মতলুব মিয়া মুখ শক্ত করে বলল, 'সেগুলি বড় মাছ । ছোট মাছ কুটতে হয় না।"

"তোমাকে বলেছে! এই দেখো এই মাছের পেটে নিশ্চয়ই কেঁচো আছে, পিঁপড়ার ডিম আছে, ব্যাঙের পচা ঠ্যাং আছে—" এই বলে শিউলি সাবধানে একটা মাছের লেজ ধরে তুলে এনে পেটে চাপ দিতেই সত্যি সত্যি ময়লা হলদে এবং কালচে কিছু নোংরা জিনিস বের হয়ে এল। শিউলি নাক কুঁচকে খানিকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "মতলুব চাচা, তুমি একটা আস্ত খবিশ!"

মতলুব মিয়ার মুখ রাগে থমথম করতে থাকে। সে চোখমুখ লাল করে বলল, "এই মেয়ে, তুমি খাওয়া নিয়ে মশকরা কর? তুমি জান যারা না খেয়ে থাকে তারা এটা খেতে পেলে কী করবে?"

"কচু করবে!" শিউলি ঠোঁট উলটে বলল, "আমি অনেকদিন না খেয়ে থেকেছি। কফিল চাচার বাসায় কিছু হলেই আমাকে না খাইয়ে রাখত, কিন্তু আমি মরে গেলেও তোমার এই মাছ খাব না। হ্যাক, থুঃ!"

"তা হলে কী খাবে?"

"তুমি আবার সবকিছু ঠিক করে রান্না করবে।"

"ইশ! মামাবাড়ির আবদার!" মতলুব মিয়া মুখ ভেংচে বলল, "এখন আমি লাটসাহেবের জন্যে সবকিছু আবার নতুন করে রান্না করব! আমার তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নাই!"

শিউলি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তা হলে আমিই রান্না করব।"

রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, "তুমি রান্না করতে পার ?"

শিউলি মাথা নেড়ে বলল, "না।"

"তা হলে?"

"মতলুব চচাও তো পারে না। সে রান্না করছে না?"

একটা যুক্তি। রইসউদ্দিন কিছু বলতে পারলেন না, তবে মতলুব মিয়া মেঘের মতো গর্জন করে বলল, "কী বললে?"

"তুমি শুধু যে রাঁধতে পার না তা-ই না। তুমি জান পর্যন্ত না কী দিয়ে রাঁধতে হয়।"

"আমি কী দিয়ে রাঁধি?"

"কেরোসিন তেল দিয়ে । তোমার সব খাবারে খালি কেরোসিনের গন্ধ। হ্যাক, থুঃ!"

মতলুব মিয়া দাঁত-কিড়মিড় করতে লাগল। তাকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে শিউলি বলল, "আর এই প্লেটগুলো দেখো।"

"কী হয়েছে প্লেটে?"

"উপর দিয়ে চিকা হেঁটে গেছে, তুমি সেই প্লেট ধোও নাই। এই দেখো, চিকার পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে।"

রইসউদ্দিন ভালো করে শিউলির প্লেটটা দেখলেন, সত্যি সত্যি প্লেটের পাশে ময়লা, ছোট ছোট পায়ের ছাপ । শিউলি রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, "রইস চাচা, তুমি অপেক্ষা করো, আমি রেঁধে আনছি। শুধু চুলোটা কেমন করে ধরাতে হয় একটু দেখিয়ে দেবে?"

মতলুব আলি সারাক্ষণ মুখ গোঁজ করে রইল। তার মাঝে সত্যি সত্যি শিউলি খানিকটা ভাত রেঁধে ফেলল, সাথে ডিমভাজা। রইসউদ্দিন অনেক দিন পর বেশ তৃপ্তি করে ভাত খেলেন।

পরদিন রইসউদ্দিন অফিসে গেছেন। টেবিলে টোস্ট বিস্কুট রাখা থাকে, তাই দিয়ে তিনি নিজে সকালের নাশতা সেরে ফেলেন। মতলুব মিয়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে—তার ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়। আজ অবিশ্যি দেরি করতে পারল না, শিউলি তাকে ডেকে তুলে ফেলল।

মতলুব মিয়া চোখ লাল করে বলল, "কী হয়েছে?"

"ওঠো। অনেক বেলা হয়ে গেছে।"

"উঠে কী হবে?"

"ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে। দেখেছ ঘরবাড়ির অবস্থা?"

মতলুব মিয়া কম্বল সরিয়ে উঠে বসল। তাকে দেখে মনে হতে লাগল সে বুঝি কারও উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। চোখ-মুখ পাকিয়ে বলল, "ছেমড়ি—"

শিউলি বাধা দিয়ে বলল, "খবরদার, আমাকে ছেমড়ি বলবে না!"

মতলুব মিয়া গর্জন করে বলল, "ছেমড়িকে ছেমড়ি বলব না তো কী বলব? শুনো ছেমড়ি, আমি এই বাসাতে আছি আজ পঁচিশ বছর—তুমি আসছ পঁচিশ ঘণ্টাও হয় নাই। এই বাসায় কী করতে হবে কী না-করতে হবে সেই হুকুম তুমি দেবে না।"

"আমি মোটেও হুকুম দিচ্ছি না। কিন্তু ঘরদোর ময়লা হয়ে আছে সেটা পরিষ্কার করতে হবে না?"

"আমার যখন ইচ্ছা হবে আমি পরিষ্কার করব। তোমাকে বলতে হবে না।"

"একশো বার বলতে হবে।"

শিউলি মুখ শক্ত করে বলল, "তুমি খালি শুয়ে শুয়ে ঘুমাবে আর রইস চাচা কষ্ট করে করে তোমাকে খাওয়াবে সেটা হবে না।"

"দেখো ছেমড়ি—"

"খবরদার আমাকে ছেমড়ি বলবে না।"

"বললে কী হবে?"

"বলে দেখো কী হয়!"

"ছেমড়ি ছেমড়ি ছেমড়ি। বলেছি । কী হয়েছে?'

শিউলি কিছু না বলে উঠে গেল। মতলুব মিয়া দেখল তার কিছুই হল না, কিন্তু তবু কেমন যেন একটু ভয় পেয়ে গেল। এইটুকুন মেয়ে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিটা কেমন যেন বাঘিনীর মতো।

মতলুব মিয়া আর কথাবার্তা না বলে বিছানা থেকে উঠে গেল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও দেখা গেল সে সারাদিন ঘরদোর একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছে। দুপুরবেলা থালা-বাসন পর্যন্ত ধুয়ে ফেলল। সন্ধে না হতেই রান্না শুরু করে দিল। তবে সে শিউলিকে চেনে না বলে বুঝতে পারল না এত করেও তার বিপদ একটুও কাটা গেল না।

কাউকে শাস্তি দিতে হলে শিউলি প্রথমে তাকে গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে, এবারেও সে তাই করল, গভীর মনোযোগ দিয়ে কয়েকদিন মতলুব মিয়ার কাজকর্ম লক্ষ করল। মতলুব মিয়ার কাজকর্ম লক্ষ করার একটামাত্র সমস্যা— লক্ষ করার মতো কোনো কাজকর্মই সে করে না। বেশির ভাগ সময়েই সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে নাহয় বসে থাকে। নেহাত দরকার না পড়লে সে নড়াচড়া করে না। পৃথিবীর সব মানুষের জীবনেই কোনো-না-কোনো উদ্দশ্য বা শখ থাকে। তার জীবনে কোনো উদ্দেশ্য বা শখ কিছুই নেই। একমাত্র যে-জিনিসটাকে শখ বলে চালানো যায় সেটা হচ্ছে সিগারেট। সারাদিনে সে বেশ কয়েকটা সিগারেট খায়। রইসউদ্দিন সিগারেটের গন্ধ একেবারে সহ্য করতে পারেন না বলে সে সিগারেট খায় নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে। শিউলি চিন্তা-ভাবনা করে ঠিক করল এই সিগারেট দিয়ে মতলুব মিয়াকে কঠিন একটা শাস্তি দিতে হবে।

মতলুব মিয়া কী সিগারেট খায় জেনে নিয়ে একদিন শিউলি পাশের দোকান থেকে দুই শলা সিগারেট এবং একটা ম্যাচের বাক্স কিনে আনল। সিগারেটের ভেতর থেকে আধাআধি তামাক বের করে সে দেশলাইয়ের বারুদগুলো চেঁছে চেঁছে ভেতরে ঢোকাল। তারপর আবার সিগারেটের তামাকটা ঢুকিয়ে দিল। এমনিতে সিগারেটটা দেখে কিছু বোঝার কোনো উপায় নেই কিন্তু আগুনটা যখন মাঝামাঝি পৌঁছে যাবে হঠাৎ করে দেশলাইয়ের বারুদ জ্বলে উঠবে। যে সিগারেট টানছে তার পিলে চমকানোর জন্যে এর থেকে ভালো বুদ্ধি আর কী হতে পারে?

দেশলাইয়ের বারুদভরা দুই শলা সিগারেট মতলুব মিয়ার বালিশের তলায় রাখা সিগারেটের প্যাকেটে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরই শিউলির কাজ শেষ। এরপর শুধু অপেক্ষা করা।

শিউলি যেটুকু আশা করেছিল মতলুব মিয়ার সিগারেট নিয়ে তার থেকে অনেক বেশি মজা হল। রাত্রে ভাত খেয়ে তার বিছানায় বসে সে সিগারেট ধরিয়ে খুব আরামে কয়েকটা টান দিয়েছে, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই সিগারেটের মাঝে যেন একটা বোমা ফাটল! স্যাঁৎ করে বিশাল আগুন জ্বলে উঠল সিগারেটের মাথায়। কিছু বোঝার আগেই সেই আগুনে মতলুব মিয়ার গোঁফে আগুন ধরে গেল।

গোঁফে আগুন লাগলে সেটা নেভাবার কোনো উপায় নেই সেটা এই প্রথমবার মতলুব মিয়া আবিষ্কার করল। দেখতে দেখতে তার নাকের ডগার সিকিভাগ গোঁফ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। মতলুব মিয়া জ্বলন্ত সিগারেট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিকট গলায় চিৎকার করে উঠে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামার চেষ্টা করল। কম্বলে জড়িয়ে গিয়ে পা বেঁধে হুড়মুড় করে নিচে পড়ে যা একটা তুলকালাম কাণ্ড হল সে আর বলার মতো নয়। জ্বলন্ত সিগারেট গিয়ে পড়ল বিছানার চাদরে—সেখানে আবার একটা ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল।

মতলুব মিয়ার চিৎকার আর হৈচৈ শুনে রইসউদ্দিন এবং তাঁর পিছুপিছু শিউলি ছুটে এল। বিছানার চাদরে আগুন জ্বলছে, পানি ঢেলে সেই আগুন নিভিয়ে রইসউদ্দিন টেনেটুনে মতলুব মিয়াকে তুলে দাঁড় করালেন। নাকের ডগায় পুড়ে গোঁফের খানিকটা উধাও হয়ে গেছে বলে তাকে দেখতে এত বিচিত্র লাগছিল যে শিউলি মুখে হাত দিয়ে

খিকখিক করে হেসে ফেলল। রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, "কী হয়েছে মতলুব মিয়া?"

মতলুব মিয়া কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "সিগারেটটা হঠাৎ কেমন জানি দুম করে ফেটে গেল!"

রইসউদ্দিন ধমক দিয়ে বললেন, "সিগারেট কি গ্যাস বেলুন যে দুম করে ফেটে যাবে?"

"বিশ্বাস করেন—" মতলুব মিয়া ভাঙা গলায় বলল, "কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ করে দুম করে ফেটে আগুন ধরে গেল।"

রইসউদ্দিন আবার ধমক দিয়ে বললেন, "আজেবাজে কথা বলবে না মতলুব মিয়া। কতবার বলেছি ঘরের মাঝে বিড়ি-সিগারেট খাবে না—সেই কথা কি শুনে দেখেছ? সিগারেটের আগুনে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছ, নিজের গোঁফ জ্বালিয়ে দিচ্ছ—ফাজলেমির তো একটা সীমা থাকা দরকার!"

মতলুব মিয়ার দুই নম্বর সিগারেট নিয়ে আরও বেশি মজা হল। কারণ সেটাতে শব্দ করে হঠাৎ দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল মাছ-বাজারে। চমকে উঠে ভয় পেয়ে বিকট চিৎকার করে মতলুব মিয়া সেই জ্বলন্ত সিগারেট ছুড়ে দিল সামনে, সেটি গিয়ে পড়ল এক মাছওয়ালার ঘাড়ে। সেই মাছওয়ালা জ্বলন্ত আগুন নিয়ে লাফিয়ে পড়ল পাশের মাছওয়ালার কোলে। মাছ-বাজারের কাদায় তারা গড়াগড়ি করতে লাগল আর তাদের ঝাঁপিতে রাখা আফ্রিকান রাক্ষুসে মাগুর মাছগুলো গড়িয়ে পড়ল নিচে। সেগুলো কিলবিল করে সাপের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, মাছ-বাজারের মানুষের পায়ে, আঙুলে কামড়ে ধরল একটি দুটি বদরাগী মাছ।

মানুষজনের হৈচৈ চিৎকার শুনে বাজারের লোকজন মনে করল বুঝি চাঁদাবাজরা এসেছে চাঁদা তুলতে। লাঠিসোটা নিয়ে কিছু মানুষ ছুটে এল তাড়া করে, কিছু বোঝার আগে দমাদম দুই-এক ঘা পড়ল মতলুব মিয়ার মাথায় আর ঘাড়ে।

সেদিন সন্ধেবেলা মতলুব মিয়া যখন বাসায় ফিরে এল তাকে দেখে রইসউদ্দিন আঁতকে উঠলেন। তার জামাকাপড় ছেঁড়া, কপালের কাছে ফুলে আছে, গালের কাছে খানিকটা ছাল উঠে গেছে এবং সে হাঁটছে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে। রইসউদ্দিন ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে তোমার মতলুব মিয়া?"

"পাবলিক ধরে মার দিয়েছে।"

"কেন?"

"ভেবেছে আমি মাছ-বাজারে ককটেল ফাটিয়েছি।"

রইসউদ্দিন চোখ কপালে তুলে বললেন, "ককটেল? তুমি ককটেল ফাটিয়েছ?"

"না। আসলে ককটেল ফাটাই নাই। সিগারেটটা যখন দুম করে বোমার মতো ফেটে গেল—"

"সিগারেট?"

"জে।" মতলুব মিয়া মাথা চুলকে বলল, "কেন যে সিগারেটগুলো এইভাবে আগুন ধরে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না।"

রইসউদ্দিনের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল শিউলি, হঠাৎ সে মুখে হাত দিয়ে খিকখিক করে হেসে উঠল। হাসির শব্দ শুনে রইসউদ্দিন চমকে উঠে তার দিকে তাকালেন। হঠাৎ তাঁর

মাথায় একটা সন্দেহের কথা মনে হল। এগুলো কি শিউলির কাজ? যে-মেয়েটি কফিলউদ্দিন আর তাঁর স্ত্রীর মতো মহা ধুরন্ধর মানুষকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দেয়, মতলুব মিয়ার মতো অকাট মূর্খ তো তার কাছে ছয় মাসের শিশু!

রইসউদ্দিন ঘুরে শিউলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "শিউলি!"

শিউলি মুখ তুলে তাকাল । বলল, "জি?"

"তুমি কি জান মতলুব মিয়ার সিগারেটে আগুন ধরে যাচ্ছে কেন?"

শিউলির মুখে দুষ্টুমির হাসি ফুটে ওঠে, সে মাথা নাড়িয়ে বলল, "জানি।"

মতলুব মিয়া হতভম্বের মতো শিউলির দিকে তাকিয়ে রইল। তোতলাতে তোতলাতে বলল, "জা-জা-জান?"

"হ্যাঁ, জানি। আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেই এরকম বিপদ হয়।"

"খা-খারাপ ব্যবহার করলে? কে-কে-কেন?"

শিউলি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বলল,"আমার একটা পোষা জিন আছে তো তাই! হি হি হি!"

শিউলির হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে রইসউদ্দিন হঠাৎ কেমন জানি দুর্বল অনুভব করতে থাকেন।

দুদিন পর মতলুব মিয়া এসে রইসউদ্দিনকে একটা ভালো বুদ্ধি দিল। বলা যেতে পারে মতলুব মিয়ার সুদীর্ঘ জীবনে এই প্রথমবার একটা কথা বলল যার ভেতরে খানিকটা চিন্তা-ভাবনার ব্যাপার আছে। সে রইসউদ্দিনকে বুদ্ধি দিল শিউলিকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়ার জন্যে। বুদ্ধিটি অবিশ্যি কোনো গভীর ভাবনা থেকে আসেনি, এটা এসেছে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা থেকে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শিউলি মতলুব মিয়ার পেছনে লেগে যায়, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় ধোওয়া, বাথরুম ধোওয়া, বাসন ধোওয়া, বাজার করা, রান্না করা— এমন কোনো কাজ নেই যেটা তার করতে হচ্ছে না। গত পঁচিশ বছরের একটানা আরাম মনে হচ্ছে রাতারাতি শেষ হতে চলেছে। শিউলিকে স্কুলে ভর্তি করে দিলে দিনের একটা বড় অংশ কাটবে স্কুলে। যতক্ষণ বাসায় থাকবে ততক্ষণ পড়োশোনাও করতে হবে— মতলুব মিয়ার পেছনে এত লাগার সুযোগ পাবে না।

শিউলিকে স্কুলে দেবার বুদ্ধিটি রইসউদ্দিনের পছন্দ হল। সত্যি কথা বলতে কি, কথাটি যে তাঁর নিজের মনে হয়নি সেজন্য তাঁর একটু লজ্জাও হল। শিউলির ছোট চাচাকে তিনি খোঁজা শুরু করেছেন। প্রথমে ব্যাপারটিকে যত অসম্ভব মনে হয়েছিল এখন সেটাকে তত অসম্ভব মনে হচ্ছে না। তাঁর নাম-ধাম জোগাড় হয়েছে। কয়েকদিনের মাঝেই আমেরিকার নানা জায়গায় চিঠিপত্র লেখা শুরু করবেন। কবে শিউলির ছোট চাচা খোঁজ পাবেন, কবে তাকে নিয়ে যাবেন তার নিশ্চয়তা নেই। পাঁচ-ছয় মাস এমনকি কে জানে বছরখানেকও লেগে যেতে পারে। ততদিন তো শিউলিকে শুধুশুধু ঘরে বসিয়ে রাখা যায় না!

স্কুলে যাবার ব্যাপারটা শিউলির খুব পছন্দ হল না, কিন্তু রইসউদ্দিন সেটাকে মোটেই গুরুত্ব দিলেন না। তাকে নিয়ে রীতিমতো জোর করে পাড়ার একটা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ভালো স্কুলে ছাত্র ভর্তি করা যেরকম খুব কঠিন, এই স্কুলটাতে মনে হল ভর্তি করানো ঠিক সেরকম সহজ। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক বা ক্লাসঘর কোনোকিছুই ঠিকভাবে নেই। বেতন দিতে রাজি থাকলে মনে হয় তারা গরু-ছাগল এমনকি চেয়ার-টেবিলও ভর্তি করে নিতে রাজি আছে!

স্কুলে গিয়ে প্রথম দিনে শিউলির কালোমতন একটা মেয়ের সাথে পরিচয় হল। স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সে খুব শখ করে তেঁতুলের আচার খাচ্ছিল। শিউলিকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এই স্কুলে ভর্তি হয়েছ?"

"হুঁ।"

"তোমার বাবা-মা নিশ্চয়ই ডিভোর্সি। বাবা-মা ডিভোর্সি হলে বাচ্চারা এই স্কুলে ভর্তি হয়। তখন তো বাচ্চার আর যত্ন থাকে না তাই সব বাবা-মা এনে এই স্কুলে ভর্তি করে দেয়। কঠিন স্কুল এটা। মাস্টার মাত্র দুইজন। মোটা মাস্টারনি আর চিকন মাস্টারনি। সাদা মাস্টারনি আর কালা মাস্টারনিও বলতে পার। রাগী মাস্টারনি আর হাসি মাস্টারনিও বলতে পার । যার যেটা ইচ্ছা সে সেইটা বলে। আমি বলি রাজি আপা আর পাজি আপা। রাজি আপা সবকিছুতেই রাজি। তুমি যদি বল, আপা আজকে পড়তে ইচ্ছা করছে না তা হলে রাজি আপা সাথে সাথে রাজি হয়ে যাবে। বলবে ঠিক আছে। যদি পাজি আপাকে বল আপা পড়তে ইচ্ছা করছে না, পাজি আপা মনে হয় বন্দুক বের করে গুলি করবে ডিচুম ডিচুম। কেউ কখনো বলে নাই। পাজি আপার ক্লাসে কোনো হাসি-তামাশা নাই। নো নো নো..."

কালোমতন মেয়েটা একটানা কথা বলে যেতে লাগল। শিউলি প্রায় মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা বলতে বলতে একসময় যখন নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু থেমেছে তখন শিউলি জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী?"

"আমার আসল নাম ছিল মৃত্যু। আম্মু অবিশ্যি স্বীকার করে না কিন্তু আমি শিওর। মৃত্যু থেকে মিতভু। মিতভু থেকে মিতু। এখন সবাই ডাকে মিতু। আমার অবিশ্যি মৃত্যু নামটাই ভালো লাগে। যখন বড় হব তখন আবার মৃত্যু করে ফেলব। কী সুইট না মৃত্যু নামটা? তোমার নাম কী? দাঁড়াও, আগেই বোলো না, দেখি আমি আন্দাজ করে বলতে পারি কি না । মানুষের চেহারার সাথে নামের মিল থাকে তো তাই চেষ্টা করলে পারা যায়। ভালো করে তাকাও আমার দিকে। তোমার নাকটা একটু বেশি চোখা, পাখির ঠোঁটের মতো লাগে। তার মানে পাখির নামে নাম। ময়না না হলে তো তোতা না হলে টিয়া। ঠিক হয়েছে?"

"উঁহুঁ। আমার নাম শিউলি।"

"ইশ ভাই! একটুর জন্যে পারলাম না! তোমার কপালটা দেখে মনে হয়েছিল বলি ফুল, একেবারে ফুলের পাপড়ির মতো ছিল। ফুল হলেই বলতাম বকুল না হলে জুঁই না হলে শিউলি। বলতাম না?"

শিউলি মাথা নাড়ল, হয়তো বলত। মিতু মেয়েটা আবার চলন্ত ট্রেনের মতো কথা বলতে শুরু করল, "তুমি প্রথম এসেছ তো তাই তোমাকে সবকিছু বলে দিতে হবে। না হলে তোমার বিপদ হতে পারে। আমাদের ক্লাসে কোনো নরমাল ছেলেমেয়ে নেই। সবগুলো অ্যাবনরমাল। অর্ধেকের বেশি হচ্ছে মেদামার্কা। সেগুলো নড়েচড়ে না, কথা বলে না। যেটা সবচেয়ে বেশি মেদামার্কা সেটার আবার চশমা আছে। সেটা পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়। সেটার নাম শরিফা, আমরা ডাকি ল্যাদল্যাদা শরিফা। বাকি অর্ধেক হচ্ছে দুর্দান্ত। এর মাঝে কয়েকটা মনে হয় এর মাকেই জেল খেটেছে। হরতালের সময় টোকাইরা গাড়ি ভাঙচুর করে জান তো— এরাও তখন তাদের সাথে গাড়ি ভাঙচুর করতে নেমে যায়। এদের লিডার হচ্ছে কাসেম। সবাই ডাকে কাউয়া কাসেম। কাউয়া কাসেম থেকে সাবধান। সবসময় তার পকেটে দুই-চারটা ককটেল থাকে। সেইদিন অঙ্ক পরীক্ষায় সরল

অঙ্কের উত্তর হল সাড়ে তিন। সরল অঙ্কের উত্তর হবে এক নাহয় শূন্য—সাড়ে তিন কেমন করে হয়? কাউয়া কাসেম তখন রেগে গিয়ে বলল, চল গাড়ি ভাঙচুর করি। ঠিক তখন পাজি আপা এল ক্লাসে। ক্যাঁক করে ঘাড়ে চেপে ধরে দুম করে মাথার মাঝে দিল একটা রদ্দা—কাউয়া কাসেম ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

শিউলি অবাক হয়ে মিতুর দিকে তাকিয়ে রইল আর মিতু একেবারে মেশিনের মতো মুখে খই ফোটাতে লাগল। একজন মানুষ যে এত কথা বলতে পারে সে নিজের চোখে না দেখলে ব্যাপারটা বিশ্বাস করত না। স্কুলের ঘণ্টা পড়ার আগেই এই স্কুল, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, মাস্টার-মাস্টারনি, দপ্তরি, বেয়ারা, বুয়া সবার সম্পর্কে শিউলির একেবারে সবকিছু জানা হয়ে গেল।

প্রথম ক্লাসটি বাংলা। পড়াতে এলেন ফরসামতন হালকা-পাতলা একজন কমবয়সী মহিলা। মিতু গলা নামিয়ে শিউলিকে বলল, "এইটা হচ্ছে রাজি আপা। রাজি আপাকে যেটা বলবে সেটাতেই রাজি।"

শিউলি দেখল কথাটি মিথ্যে নয়, রোল কল করার পরই মিতু হাত তুলে বলল, "আপা আজকে আমরা পড়ব না।"

"কেন পড়বে না মিতু?"

মিতু শিউলিকে দেখিয়ে বলল, "এই যে এই মেয়েটা আজকে আমাদের ক্লাসে নতুন এসেছে, সেইজন্যে আনন্দ করব।"

রাজি আপা হাসিহাসি মুখে বললেন, "কিন্তু তা হলে এই নতুন মেয়েটা যদি মনে করে এই স্কুলে মোটে পড়াশোনা হয় না?"

পেছনের বেঞ্চে বসা কুচকুচে কালো একটা ছেলে মোটা গলায় বলল, "তা হলে তো ভালোই হয়।"

মিতু ফিসফিস করে শিউলিকে বলল, "এইটা হচ্ছে কাউয়া কাসেম।"

একেবারে সামনে বসে থাকা চশমা-পরা একটা মেয়ে একেবারে কাঁদোকাঁদো হয়ে বলল, "না আপা না। পড়াশোনা না হলে কেমন করে হবে?"

মিতু ফিসফিস করে বলল, "ল্যাদল্যাদা শরিফা।"

রাজি আপা বললেন, "আচ্ছা, তা হলে এক কাজ করা যাক। পড়াশোনাও হোক আবার আনন্দও হোক। সবাই একটা করে চার লাইনের কবিতা লেখো।"

ল্যাদল্যাদা শরিফা বলল, "কিসের উপর লিখব আপা? ছয় ঋতুর ওপরে? নাকি প্রকৃতির ওপরে?"

"সবাই নিজের ওপরে লেখো। তা হলে এই যে নতুন মেয়েটা সবার সম্পর্কে জানতে পারবে। ভালো হবে না?"

ল্যাদল্যাদা শরিফা বলল, "খুব ভালো হবে আপা খুব ভালো হবে । কিন্তু আপা আমি নিজের সম্পর্কে মাত্র চার লাইনে কী লিখব? আমি কি বেশি লিখতে পারি? আট লাইন না হলে ষোলো লাইন?

রাজি আপা বললেন, "ঠিক আছে লেখো।"

পেছন থেকে কাউয়া কাসেম বলল, "নিয়ম যখন ভাঙাই হল আমিও ভাঙি?"

রাজি আপা বললেন, "তুমিও বেশি লিখবে?"

"না আপা। আমি কম লিখব, এক লাইন লিখি?'

"এক লাইনে কবিতা হয় না কাসেম। কমপক্ষে চার লাইন লিখতে হবে। নাও সবাই শুরু করো।"

সবাই মাথা গুঁজে লিখতে শুরু করল। কোনো শব্দ নেই, শুধু কাগজের ওপর পেন্সিলের ঘসঘস শব্দ। মাঝে মাঝে শুধু কেউ-একজন আটকে-থাকা একটা নিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু করছে।

কুড়ি মিনিট পর প্রথম কবিতাটি লেখা হল। লিখেছে মোটাসোটা গোলগাল একটি ছেলে, তার নাম সুখময়। রাজি আপা তাকে কবিতাটি পড়ে শোনাতে বললেন, সে লাজুক-মুখে পড়ে শোনাল :

"আমার নাম সুখময়
কিন্তু আমার জীবন বেশি সুখময় নয়,
কারণ—মাঝে মাঝে আমার
টনসিলে ব্যথা হয়।"

রাজি আপা হাততালি দিয়ে বললেন, "ভেরি গুড সুখময়, খুব সুন্দর কবিতা হয়েছে! এখন কে পড়ে শোনাবে?"

ক্লাসের মাঝামাঝি বসে-থাকা একটি মেয়ে তার কবিতার খাতা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার চুল পরিপাটি করে বাঁধা, ঠোঁটে লিপস্টিক, মুখে পাউডার। সে কাঁপা গলায় বলল,

"আমার নাম ফারজানা হক বন্যা
আমি একদিন হব মডেল কন্যা
আমি হব বিখ্যাত গান গায়িকা
আমি হবই হব প্যাকেজ নাটকের নায়িকা।"

রাজি আপা মুখ টিপে হেসে বললেন, "খুব সুন্দর কবিতা বন্যা। তুমি নিশ্চয়ই একদিন নায়িকা হবে! এরপর কে পড়তে চাও?"

পেছনের বেঞ্চ থেকে কাসেম বলল, "আমারটা পড়ব আপা?"

"পড়ো দেখি।"

কাসেম উঠে দাঁড়িয়ে মোটা গলায় বলল,

"কাসেম কাসেম
ঢেম ঢেম
ভুম ভাম ভেম
ঢেম ঢেম।"

রাজি আপা মাথা নেড়ে বললেন, "ভুম ভাম ঢেম এগুলো কিসের শব্দ কাসেম?"

"ককটেলের।"

"উঁই। এরকম লিখলে হবে না। নিজের সম্পর্কে লিখতে হবে। আবার চেষ্টা করো।"

কাসেম মাথা নেড়ে আবার তার কাগজ নিয়ে বসে গেল। রাজি আপা শরিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার কী খবর শরিফা?"

"প্রথম চার লাইন হয়ে গেছে আপা।"

"পড়ে শোনাও দেখি আমাদের।"

ল্যাদল্যাদা শরিফা উঠে দাঁড়িয়ে গলা পরিষ্কার করে পড়তে শুরু করল :

"আমি শরিফা বেগম অতি বড় এক জ্ঞানপিপাসু মেয়ে।
প্রতিদিন আমি বই নিয়ে বসি রাতের খাওয়া খেয়ে।
অঙ্ক কষি, বাংলা পড়ি, পড়ি বিজ্ঞান বই
হোমওয়ার্ক সব শেষ করে বলি আর হোমওর্য়াক কই?"

রাজি আপা মুখ টিপে হেসে বললেন, "তোমার নিজেকে তুমি খুব সুন্দর ফুটিয়েছ শরিফা।"

শরিফা একগাল হেসে বলল, "এখনও তো শেষ হয়নি। শেষ হলে দেখবেন।"

রাজি আপা শিউলির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে আমাদের নতুন মেয়ে! তোমার কত দূর?"

শিউলি মাথা নাড়ল, "হয়ে গেছে।"

আপা বললেন, "পড়ো দেখি।"

শিউলি শুরু করল :

"শিউলি আমার নাম—
আমার সাথে তেড়িবেড়ি করলে ঘুসি মারি ধাম ধাম।
আমার সাথে ফাইট?
এমন শিক্ষা দেব আমি যে জন্মের মতো টাইট!"

শিউলির কবিতা শুনে রাজি আপার চোয়াল ঝুলে পড়ল, কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে শুকনো গলায় বললেন, "ইয়ে—নিজেকে খুব সুন্দর করে প্রকাশ করেছ শিউলি। তবে কিনা—"

পেছন থেকে কাউয়া কাসেম বলল, 'ফার্স্ট ক্লাস কবিতা হইছে আপা। একেবারে ফার্স্ট ক্লাস! রবীন্দ্রনাথ ফেইল।"

সেকেন্ড পিরিওডে অঙ্ক ক্লাস। ঘণ্টা পড়ার পর শিউলি দেখল মোটামতন একজন কালো মহিলা মিলিটারির মতন দুমদাম করে পা ফেলে ক্লাসে ঢুকলেন। মিতু তার ব্যাগের ভেতর থেকে একটা মাঝারি সাইজের শিশি বের করে শিউলির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও।"

"এটা কী?"

"তেল। কানে লাগিয়ে নাও।"

"কানে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"টের পাবে একটু পরেই।"

শিউলি ঠিক বুঝতে পারল না কেন কানে তেল লাগাতে হবে, কিন্তু আর প্রশ্ন করল না। মিতুর দেখাদেখি দুই কানের লতিতে একটু তেল মেখে নিল। তেলের শিশিটা মিতুকে ফেরত দেওয়ার আগেই আপা ক্লাসে ঢুকে গেলেন, শিউলি তাড়াতাড়ি শিশিটা ডেস্কের নিচে লুকিয়ে ফেলল।

কালো মোটা এবং রাগী-রাগী চেহারার আপা ক্লাসে ঢুকেই টেবিলের উপর দুম করে তাঁর খাতাপত্র রেখে হুংকার দিলেন, "কে কে হোমওয়ার্ক আনে নাই?"

সারা ক্লাস চুপ করে রইল, হয় সবাই হোমওয়ার্ক করে এনেছে নাহয় যারা আনেনি তাদের সেটা স্বীকার করার সাহস নেই। শিউলি মাত্র আজকেই প্রথম ক্লাসে এসেছে, তার হোমওয়ার্ক আনার কথা কি না সেটাও সে ভালো করে জানে না। আপা চোখ পাকিয়ে সারা ক্লাসের দিকে তাকালেন। শিউলি দেখল তার চোখের সাদা অংশে লাল রঙের রগগুলো ফুলে রয়েছে। আপা দুই পা এগিয়ে এসে সামনে যাকে পেলেন খপ করে তার কান ধরে টেনে প্রায় শূন্যে তুলে ফেললেন। সেইভাবে ঝুলিয়ে রেখে বললেন, "দেখা হোমওয়ার্ক।"

একটা ছেলেকে কানে ধরে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলে তার পক্ষে হোমওয়ার্ক দেখানো খুব সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু সে তার মাঝেই হাতড়ে হাতড়ে তার বইখাতা ঘেঁটে তার অঙ্কখাতা বের করে এগিয়ে দিল। আপা সেইভাবে কান ধরে তাকে ঝুলিয়ে রেখে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হুংকার দিলেন, "কোথায় হোমওয়ার্ক খুলে দেখা।"

ছেলেটা আধা-ঝুলন্ত অবস্থায় খাতা খুলে হোমওয়ার্কটি বের করে দিল, শিউলি ভাবল এবার নিশ্চয়ই তার কানটা ছেড়ে দেওয়া হবে কিন্তু আপা ছাড়লেন না। কানে ধরে ঝুলিয়ে রেখে খাতার পৃষ্ঠা উলটিয়ে কিছু-একটা দেখে বাজখাঁই গলায় ধমক দিয়ে বললেন, "পেন্সিল দিয়ে লিখেছিস কেন?"

ছেলেটা চিঁচি করে বলল, "তা হলে কী দিয়ে লিখব?"

"কলম দিয়ে, গাধা কোথাকার!"

শিউলি ভাবল এখন নিশ্চয়ই তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু আপা তাকে ছাড়লেন না। সেভাবে ঝুলিয়ে রাখলেন। আরও খানিকক্ষণ খাতার দিকে তাকিয়ে থেকে হুংকার দিয়ে বললেন, "বলেছি না খাতার পাশে এক ইঞ্চি মার্জিন রাখতে? এত বেশি রেখেছিস কেন?"

এতক্ষণে শিউলি বুঝে গিয়েছে এই আপার নাম কেন পাজি আপা রাখা হয়েছে—মহাপাজি আপা রাখলেও খুব একটা ভুল হত না। শিউলির এবারে সন্দেহ হতে থাকে কানে ধরে রাখা ছেলেটিকে আদৌ ছাড়া হবে কি না। যখন সে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে গেল যে কানে ধরে ঝুলিয়ে রেখে এই এক ঘণ্টাতেই ছেলেটার কানটি খানিকটা লম্বা করে দেওয়া হবে তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে পাজি আপা দুপা এগিয়ে গিয়ে একটি মেয়ের কান ধরে তাকে শূন্যে তুলে ফেললেন। ছেলেটার দুর্গতি দেখে সে আগেই তার হোমওয়ার্কের খাতা খুলে রেডি হয়ে ছিল। মহাপাজি আপা তাই তাকে হোমওয়ার্কের কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন না, হুংকার দিয়ে জানতে চাইলেন, "লেফটেন্যান্ট বানান কর দেখি!"

অঙ্ক ক্লাসে কেন লেফটেন্যান্ট বানান করতে হবে সেটা শিউলি বুঝতে পারল না কিন্তু ক্লাসে সবার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল এই ক্লাসে কেউ এই সমস্ত ছোটখাটো জিনিস নিয়ে মাথা ঘামায় না। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু মেয়েটা সত্যি সত্যি লেফটেন্যান্ট বানান করে ফেলল।

পাজি আপা এতে আরও রেগে গেলেন। দাঁত-কিড়মিড় করে বললেন,' 'ডায়ারিয়া?"

মেয়েটা শুকনো মুখে বলল, "কার?"

"কারও না গাধা কোথাকার! বানান কর।"

"মেয়েটা ঢোক গিলে চেষ্টা করল, "ডি-আই-আই-আর—"

মহাপাজি আপা কানে ধরে ঘ্যাঁচ করে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মেয়েটাকে আরও দুইঞ্চি ওপরে তুলে ফেললেন। মেয়েটা যন্ত্রণার একটা শব্দ করে থেমে গেল, মনে হয় বুঝতে পারল এই আপার সামনে কাতর শব্দ করে কোনো লাভ নেই। আপা বললেন, "পড়াশোনার নামে বাতাস নেই, দিনরাত শুধু নখড়ামো? ধ্যাষ্টামো? বাঁদরামো? একেবারে সিধে করে ছেড়ে দেব।"

শিউলি একটা নিশ্বাস ফেলল, কেউ যদি এখানে নখড়ামো ধ্যাষ্টামো বা বাঁদরামো করে থাকে সেটা হচ্ছে এই পাজি আপা। কাউকে যদি সিধে করার দরকার থাকে তা হলে এই মহাপাজি আপাকে।

পঞ্চম ছেলেটিকে কানে ধরে ঝুলিয়ে রেখে মনে হল পাজি আপা প্রথমবার শিউলিকে দেখতে পেলেন। খুব গরমের দিনে রোদের মাঝে হেঁটে এসে হঠাৎ করে ঠাণ্ডা পেপসির বোতল দেখলে মানুষের চোখে যেরকম একটা ভাব ফুটে ওঠে পাজি আপার চোখে ঠিক সেরকম ভাব ফুটে উঠল। আপা থপ থপ করে হেঁটে শিউলির সামনে হাজির হলেন, জিব দিয়ে সুড়ুৎ করে লোল টেনে বললেন, "নতুন মেয়ে? আরেকটা বাঁদর? নাকি আরেকটা শিম্পাঞ্জি?"

পাজি আপা মাথা নিচু করে শিউলির চোখে চোখ রেখে তাকালেন। দূর থেকে ভালো করে দেখতে পায়নি কাছে আসার পর শিউলি দেখতে পেল আপার নাকের নিচে পাতলা গোঁফের রেখা। আপা নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা শব্দ করলেন, "এই ক্লাসে সবাইকে আমি সিধে করে রাখি। মনে থাকবে?"

শিউলি মাথা নাড়ল, তার মনে থাকবে।

"আমাকে দেখেছ তো? দুষ্টু ছেলেপিলের আমি কল্লা ছিঁড়ে ফেলি। বুঝেছ?"

শিউলি আবার মাথা নাড়ল, সে বুঝেছে।

পাজি আপা শিউলির আরও কাছে এসে বললেন, "এইবার বলো দেখি চান, আমাকে দেখে তোমার কী মনে হয়?"

"সত্যি বলব?"

"বলো।"

"আজকে আপনি মোচ কামাতে ভুলে গেছেন।"

সারা ঘরে হঠাৎ একেবারে পিনপতন স্তব্ধতা নেমে এল। মনে হল একটা মাছি হাঁচি দিলেও বুঝি শোনা যাবে। পাজি আপা নিজের কানকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারলেন না, শিউলির দিকে মুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা ঘুরিয়ে ক্লাসের দিকে তাকালেন। ক্লাসের সবাই তখনও তাঁর দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। ঠিক তখন হঠাৎ কেউ-একজন একটা বিদঘুটে শব্দ করল, হাসি আটকে রাখার চেষ্টা করার পরও যখন হাসি বের হয়ে আসে তখন যেরকম শব্দ হয় শব্দটা অনেকটা সেরকম। হাসি সাংঘাতিক ছোঁয়াচে জিনিস, হাম বা জলবসন্ত থেকেও বেশি ছোঁয়াচে। তাই হঠাৎ একসাথে সারা ক্লাসের নানা কোনা থেকে বিদঘুটে শব্দ শোনা যেতে লাগল। এক সেকেন্ড পর দেখা গেল ক্লাসের সবাই মুখে হাতচাপা দিয়ে হিহি করে হাসতে শুরু করেছে।

পাজি আপা চোখ পাকিয়ে ক্লাসের সবার দিকে তাকালেন, কয়েক পা এগিয়ে ক্লাসের মাঝামাঝি দাঁড়ালেন, এমনকি একটা ছোট হুংকারও দিলেন। কিন্তু কোনো লাভ হল বলে মনে হল না, সবাই হাসতেই থাকল। তখন মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন শিউলির দিকে। হুলো বিড়াল পাখির ছানার উপর লাফিয়ে পড়ার আগে চোখের দৃষ্টি যেরকম হয়, তাঁর চোখের

দৃষ্টি হল হুবহু সেরকম। নাক দিয়ে বিদঘুটে একটা শব্দ করে তখন চলন্ত ট্রেনের মতো ছুটে আসতে লাগলেন, শিউলি তখন বুঝতে পারল তার এখন বেঁচে থাকার একটিমাত্র উপায়।

মিতুর দেওয়া তেলের শিশিটা তখনও তার হাতে, ছিপিটা খুলে সাবধানে সে উপুড় করে তেলটুকু ঢেলে দিল সামনে। পাজি আপা এতকিছু খেয়াল করলেন না, হেঁটে একেবারে সেই তেলঢালা পিচ্ছিল জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। গলা দিয়ে বাঘের মতো শব্দ করে শিউলির কান ধরার চেষ্টা করলেন। ধরেও ফেলেছিলেন প্রায়, কিন্তু কানে তেল মাখিয়ে রেখেছিল বলে শিউলি পিছলে মাথা বের করে নিল। পাজি আপা তাল সামলাতে পারলেন না, তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে মেঝেতে ঢেলে-রাখা তেলে আছাড় খেলেন।

ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে সবিস্ময়ে দেখল তিনি পিছলে যাচ্ছেন, তাল সামলানোর চেষ্টা করছেন, একটা বেঞ্চ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলেন, ধরে রাখতে পারলেন না, মুখ দিয়ে বিকট গাঁগাঁ শব্দ করতে করতে পাজি আপা উলটে পড়লেন। সমস্ত ক্লাসঘর তখন কেঁপে উঠল, মনে হল কাছাকাছি কোথাও যেন অ্যাটম বোমা পড়েছে!

ক্লাসে তখন একটা অত্যন্ত বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, ছেলেমেয়েরা হঠাৎ করে আবিষ্কার করল, এই যে ভয়ংকর পাজি আপা তাঁকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সেই আপাও একেবারে সাধারণ মানুষের মতো আছাড় খেয়ে পড়তে পারেন। শুধু তাই নয়, আছাড় খেয়ে পড়ে যাবার পর তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে যখন উঠতে না পেরে হাঁসফাঁস করতে থাকেন তখন তাঁকে এতই হাস্যকর দেখাচ্ছিল যে কারওই বুঝতে বাকি থাকে না যে পাজি আপার ভয় দেখানোর পুরো ব্যাপারটাই আসলে একটা ভান।

ছেলেমেয়েদের ভয়ডর এত কমে গেল যে হেডমাস্টার যখন কী হয়েছে খোঁজ নিতে এলেন তখন তিনি আবিষ্কার করলেন, ছেলেমেয়েরা হাসতে হাসতে গড়াগড়ি খেতে খেতে তাঁকে টেনেটুনে ঠেলেঠুলে তোলার চেষ্টা করছে—যেন পাজি আপা তাদেরই মতো একজন ক্লাসের ছেলে বা মেয়ে।

পাজি আপা এরপর আর কোনোদিন শিউলির ক্লাসে পড়াতে আসেননি।

৪

শিউলির স্কুল বাসা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। এটুকু পথ হেঁটে যেতে দশ মিনিটও লাগার কথা নয় কিন্তু শিউলির প্রতিদিনই প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে যায়। তার ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে তাই সোজাসুজি স্কুলে না গিয়ে প্রত্যেকদিনই একটু ঘুরপথে স্কুলে যায়। নতুন নতুন রাস্তা আবিষ্কার করে, নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার করে। সেই নতুন রাস্তায় নতুন জায়গায় কত বিচিত্র রকমের মানুষ, দেখতে শিউলির বড় ভালো লাগে। শিউলির সবচেয়ে ভালো লাগে বাসস্টেশনের মানুষজনকে দেখতে। ব্যস্ত হয়ে ছুটতে ছুটতে লোকজন আসে, কেউ তাড়াতাড়ি উঠে যায়, কেউ উঠতে পারে না, মাঝে মাঝে গ্রামের মানুষজন আসে, তারা কোনো তাল খুঁজে পায় না। বাসের হেল্পারদের দেখতেও খুব মজা লাগে, যখন মনে হয় কিছুতেই তারা বাসে উঠতে পারবে না, তখনও তারা কীভাবে কীভাবে জানি দৌড়ে বাসে গিয়ে ঝুলে পড়ে।

এই বাসস্টেশনে শিউলি একদিন একটা পকেটমারকে আবিষ্কার করল। শিউলি বিকেলবেলা স্কুল থেকে বাসায় আসতে আসতে বাসস্টেশনের কাছে থেমেছে। একপাশে

কিছু খালি প্যাকিংবাক্স রাখা আছে। তার একটার উপর পা ঝুলিয়ে বসে মানুষজনকে বাসে উঠতে দেখছে তখন হঠাৎ সে ঘটনাটা ঘটতে দেখল। পকেটমারটা ভান করল সেও বাসে উঠছে। ভিড়ের মাঝে ঠেলাঠেলি করার ভান করে সে হঠাৎ সামনে হাত বাড়িয়ে একজন মানুষ ছাড়িয়ে তার পরেরজনের পকেট থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিল। পুরো ঘটনাটা ঘটল একেবারে চোখের পলকে, ম্যাজিকের মতন। যে-মানুষের পকেট মারা হয়েছে সে কিছু টেরই পেল না, দাঁত বের করে হাসতে হাসতে আরেকজনের সাথে কথা বলতে বলতে বাসের ভেতরে ঢুকে গেল।

শিউলি চিৎকার করে পকেটমারটাকে ধরিয়ে দিতে পারত কিন্তু ধরিয়ে দিল না, তার কারণ পকেটমারটা আসলে বাচ্চা একটা ছেলে। দেখে মনে হয় তার থেকেও দুবছরের ছোট। এইটুকুন ছোট ছেলে হাতসাফাইয়ের এরকম চমৎকার কাজ শিখে গেছে দেখে শিউলি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। সে দেখল বাচ্চা-পকেটমার বাস থেকে নেমে কিছুই হয়নি এরকম ভান করে হেঁটে যেতে শুরু করেছে। শিউলিও প্যাকিং বাক্স থেকে নেমে তার পিছুপিছু যেতে থাকল। ছেলেটা দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে উদাস-উদাস মুখে হেঁটে যেতে থ্যাকে। শিউলি দেখতে পেল পকেটে তার হাত নড়ছে, নিশ্চয়ই মানিব্যাগের টাকা সরিয়ে নিচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সে একটা চিঠি ফেলার বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। শিউলি দেখল পকেটখালি মানিব্যাগটা বের করে সে চিঠি ফেলার বাক্সের ভেতরে ফেলে দিল, সে যে মানিব্যাগটা সরিয়েছে তার কোনো প্রমাণ রইল না। একেবারে নিখুঁত কাজ।

ছেলেটা কিছুই হয়নি এরকম ভান করে মাথা ঘুরিয়ে চারদিক দেখে হেঁটে হেঁটে একটা চায়ের দোকানে ঢুকে গেল। শিউলি বাইরে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বাসায় ফিরে এল।

এর পর থেকে শিউলি সময় পেলেই বাসস্টেশনে এসে সেই বাচ্চা পকেটমারকে খুঁজে বের করত। গায়ের রং শ্যামলা, মাথার চুল ধূলিধূসরিত। নীল রঙের একটা প্যান্ট, সবুজ রঙের চেক চেক শার্ট, খালি পা। ছেলেটার চোখে উদাস-উদাস একরকম ভাব। কেউ দেখলে তাকে কবি নাহয় শিল্পী বলে সন্দেহ করতে পারে, কিন্তু কিছুতেই পকেটমার বলে সন্দেহ করবে না। ছেলেটা ফুটপাতে বসে একটা ঘাস চিবুতে চিবুতে কিছুই দেখছে না এরকম ভান করে চোখের কোনা দিয়ে কার পকেট মারা যায় সেটা তীক্ষ্ণচোখে লক্ষ করত। যখন একটা ভালো শিকার পাওয়া যেত তখন সে উঠে দাঁড়াত। শিউলি দেখত গলায় ঝুলানো একটা তাবিজ বের করে সে চোখ বন্ধ করে একবার চুমো খেয়ে নিত। তারপর উদাস-উদাস ভান করে হেঁটে যেত। সাপ যেভাবে ছোবল মারে ছেলেটা সেভাবে মানুষের পকেটে ছোবল মারত। শিউলি তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থেকেও বুঝতে পারত না কীভাবে চোখের পলকের মাঝে সে পকেটটা খালি করে ফেলছে— এককথায় অপূর্ব একটা কাজ!

সেদিন ঠিক এভাবে শিউলি বাসস্টেশনে বসে বসে পকেটমার বাচ্চাটাকে দেখছে। ফুটপাতে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ল। শিউলি দেখল গলা থেকে তাবিজটা বের করে একবার চুমো খেয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। শিউলি আন্দাজ করার চেষ্টা করল কোন মানুষটার পকেট মারবে, কিন্তু বুঝতে পারল না।

সামনে একটা ছোটখাটো ভিড়। ছেলেটা সেই ভিড়ে ঢুকে গেল। প্রতিবার সে পকেট মারতে যায় শিউলির তখন কেমন যেন ভয় ভয় করতে থাকে, যদি ধরা পড়ে যায় তখন কী হবে? শিউলি নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে আর ঠিক তখন হঠাৎ ভিড়ের মাঝে একটা হৈচৈ শুনতে পেল, কে যেন চিৎকার করে বলল, 'পকেটমার! পকেটমার!"

শিউলির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সর্বনাশ! এখন কী হবে? উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে যা দেখল তাতে তার হৃৎপিণ্ড থেমে যাবার মতো অবস্থা হল। শুকনোমতন রাগী-রাগী চেহারার একজন মানুষ বাচ্চা পকেটমারের চুলের মুঠি ধরে মুখের মাঝে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মেরে বসেছে, দেখতে দেখতে তার নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত বের হয়ে এল। শুকনো মানুষটা ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "শুওরের বাচ্চা, হারামখোর, খুন করে ফেলব তোকে। জানে শেষ করে ফেলব।"

এই বলে মানুষটা আবার ছেলেটার মুখে আরেকটা ঘুসি মারল।

হাম এবং জলবসন্তের মতো মারপিট জিনিসটাও মনে হয় সংক্রামক। হঠাৎ করে ভিড়ের সবাই মিলে ছেলেটাকে ধরে মারতে লাগল, ইশ, সে কী ভয়ানক মার! দেখে মনে হল এক্ষুনি বুঝি ছেলেটাকে খুন করে ফেলবে। শিউলি আর সহ্য করতে পারল না, "থামান—থামান! বন্ধ করেন—কী করছেন—সর্বনাশ! মেরে ফেলবেন নাকি!" এইসব বলতে বলতে সে ভিড় ঠেলে প্রায় ছুটে গিয়ে ছেলেটাকে আড়াল করার চেষ্টা করল এবং ফুটফুটে স্কুলের একটা মেয়েকে এভাবে ছুটে আসতে দেখে সবাই এক সেকেন্ডের জন্যে মার বন্ধ করল।

শুকনোমতো যে-মানুষটা ছেলেটার চুল ধরে রেখেছিল সে তার মাথা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শিউলির দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

"ছেলেটাকে মারছেন কেন?"

"মারব না তো কোলে নিয়ে চুমা খাব? শালার ব্যাটা পকেটমার—"

ছেলেটা এই প্রথম কথা বলল, মুখ থেকে রক্তমাখা থুতু ফেলে বলল, "কে বলছে আমি পকেটমার?"

মানুষটা বলল, "আমি বলছি। আমার পকেট থেকে মানিব্যাগ সরিয়েছিস তুই।"

"আমি? কোথায় মানিব্যাগ?"

"শালার ব্যাটা, তুই পকেটে ঢুকিয়েছিস আমি স্পষ্ট দেখেছি।"

"দেখেছেন?" ছেলেটা হাতের উলটো পিঠ দিয়ে নাকের রক্ত পরিষ্কার করতে করতে বলল, "মিছা কথা!"

মানুষটা দাঁত-কিড়মিড় করে বলল, "যদি বের করতে পারি, হারামজাদা?"

ছেলেটা পিচিক করে আবার রক্তমাখা থুতু ফেলে বলল, "আর যদি না পারেন?"

মানুষটা কোনো কথা না বলে নিচু হয়ে তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। ছেলেটার পকেটে কোনো মানিব্যাগ নেই, চারটা মার্বেল আর একটা ওষুধের হ্যান্ডবিল পাওয়া গেল। মানুষটার চোয়াল ঝুলে পড়ে এবং হঠাৎ করে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভাঙা গলায় বলল "সর্বনাশ! মানিব্যাগ? আমার মানিব্যাগ!"

ছেলেটাকে ঘিরে যারা দাঁড়িয়ে ছিল তাদের একজন বলল, "পকেট মেরেছে পকেটমার আর খামোকা এই বাচ্চাটাকে মারলেন!"

মানুষটা তখন তার মানিব্যাগের শোকে পাগল হয়ে গেছে। ধাক্কা মেরে ছেলেটাকে প্রায় ফেলে দিয়ে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে। মনে হয় সে বুঝি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়েই আসল পকেটমারকে ধরে ফেলবে।

মানুষটা চলে যেতে চাইছিল, ছেলেটা লোকটার শার্টের কোনা ধরে ফেলল, মুখ শক্ত করে বলল, "আপনি আমাকে মিছামিছি মারলেন কেন?"

একটু আগেই যারা ছেলেটাকে ধরে দুই-এক ঘা লাগিয়েছে তাদেরই একজন মনে হল এখন ছেলেটার পক্ষ নিয়ে শুকনো মানুষটাকে দুই-এক ঘা লাগাতে চাইছিল, মানুষটা

শার্টের হাতা গুটিয়ে বলল, "এই যে ভদ্রলোক, ছেলেটাকে যে মিছামিছি মারলেন? এখন আপনাকে ধরে দেই কয়েকটা?"

শুকনো মানুষটা মুখ খিঁচিয়ে বলল, "আমি মিছামিছি মারি নাই। এই হারামির বাচ্চার সাথে তার দলবল আছে, তাদের হাতে আমার ব্যাগ সরিয়ে দিয়েছে।"

"কখন সরাল? আপনি না ধরে রাখলেন?"

"আপনার এত দরদ কেন? তাদের দলের একজন নাকি?"

"কী? আপনি কী বলতে চান? আমি পকেটমার? আপনার এত বড় সাহস!"

দেখতে দেখতে মানুষগুলো ঝগড়া লাগিয়ে দিল, এই ফাঁকে শিউলি ছেলেটার হাত ধরে টেনে বের করে আনে। অল্প সময়ের মাঝে ছেলেটাকে ধরে শক্ত মার দেওয়া হয়েছে, ছেলেটার নাকমুখ দিয়ে এখনও রক্ত ঝরছে। হাঁটছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

ছেলেটা মাটিতে পিচিক করে থুতু ফেলে শিউলির দিকে তাকিয়ে বলল, "মানুষের মনে কোনো মায়া মহব্বত নাই।"

শিউলি চোখ পাকিয়ে বলল, "মানিব্যাগটা কী করেছ?"

ছেলেটা যেন খুব অবাক হয়ে গেছে সেরকম ভান করে বলল, "কোন মানিব্যাগ?"

"যেটা তুমি পকেট মেরেছ।"

"আমি? আমি পকেট মেরেছি?"

"হ্যাঁ।"

শিউলি চোখ ছোট ছোট করে বলল, "আমি তোমাকে বহুদিন থেকে লক্ষ করে আসছি। আমি সব জানি।"

ছেলেটার মুখে হঠাৎ ভয়ের একটা ছাপ পড়ল, কাঁপা গলায় বলল, "কী জান?"

"তোমার গলায় একটা তাবিজ থাকে। পকেট মারার আগে তুমি সেটাকে চুমু খাও।"

ছেলেটার মুখ হঠাৎ হাঁ হয়ে গেল। শিউলি মুখ শক্ত করে বলল, "পকেট মেরে তুমি ম্যানিব্যাগ থেকে টাকা সরিয়ে খালি ব্যাগটা ঐ চিঠির বাক্সে ফেল।"

ছেলেটার চোখেমুখে এবারে একটা আতঙ্ক এসে ভর করল। হঠাৎ সে ছুটতে আরম্ভ করল কিন্তু ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে খুব বেশিদূর যেতে পারল না। শিউলি পেছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। শার্টের কলার ধরে বলল, "তুমি ভয় পেয়ো না। আমি কাউকে বলব না।"

"খোদার কসম?"

"খোদার কসম।"

"শান্নি পীরের কসম?"

শান্নি পীর কী জিনিস শিউলি জানে না কিন্তু তবু বলল, "শান্নি পীরের কসম।"

ছেলেটা মনে হল একটু শান্ত হল, পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হল সেটা অবিশ্যি বলা যায় না, একটু ভয়ে ভয়ে শিউলির দিকে তাকিয়ে রইল। শিউলি বলল, "আমি জানি তুমি ঐ মানুষটার পকেট মেরেছ। এখন বলো দেখি মানিব্যাগটা কোথায় সরিয়েছ?"

ছেলেটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমার ব্যাগে।"

"আমার ব্যাগে?" শিউলি হতভম্ব হয়ে বলল, "কী বললে? আমার ব্যাগে?"

"হ্যাঁ।"

শিউলি ছেলেটার কথা একেবারেই বিশ্বাস করল না, কিন্তু তবুও তার স্কুলব্যাগ খুলে ভেতরে উঁকি দিয়ে হঠাৎ করে তার শরীর জমে গেল। সত্যি সত্যি তার স্কুলব্যাগের ভেতরে একটা পেটমোটা মানিব্যাগ।

শিউলি হতবাক হয়ে বলল, "আ-আ-আমার ব্যাগের ভেতরে এটা কেমন করে এল?"

"আমি রেখেছি।"

"কখন রেখেছ?"

"তুমি যখন আমার কাছে দৌড়ে এসেছ তখন।"

ছেলেটা আবার পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, "ম্যানিব্যাগটা সরাতে না পারলে কপালে দুঃখ ছিল।"

শিউলি চোখ লাল করে বলল, "আর যদি কেউ দেখত মানিব্যাগ আমার ব্যাগের ভিতরে রাখছ?"

ছেলেটা উদাস-উদাস মুখে বলল, "তা হলে তোমার কপালেও দুঃখ ছিল।"

শিউলি হতবাক হয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা বলল, "মানিব্যাগটা দাও, আমি যাই।"

"কী করবে মানিব্যাগ দিয়ে?"

"দেখি লাভ হল নাকি লোকসান হল। দিনকাল খুব খারাপ। আজকাল মানুষ পকেটে টাকা-পয়সা বেশি রাখে না।"

শিউলি আর ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার মোড়ে এসে হাজির হয়েছে, সেখানে দুজন ট্রাফিক-পুলিশ কথা বলছে। কাছেই মোটরসাইকেলে একজন পুলিশ অফিসার বসে। ছেলেটা পুলিশকে খুব ভয় পায় মনে হল, তাদেরকে দেখেই হঠাৎ করে কেমন জানি একেবারে সিঁটিয়ে গেল। শিউলির কী মনে হল কে জানে, হঠাৎ সে পুলিশগুলোর কাছে গিয়ে বলল, "এই যে, শোনেন।"

মোটরসাইকেলে বসে-থাকা পুলিশ অফিসার বললেন, "কী হল খুকি?"

শিউলি তার স্কুলব্যাগে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগটা বের করে পুলিশ অফিসারের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে এইটা রাস্তায় পড়ে ছিল।"

পুলিশ অফিসারটা মানিব্যাগটা হাতে নিয়ে শিস দেবার মতো শব্দ করে বললেন, "সর্বনাশ! অনেক টাকা ভেতরে!"

শিউলি জিজ্ঞেস করল, "ঠিকানা আছে ভেতরে?"

পুলিশ অফিসার মানিব্যাগের কাগজপত্র দেখে বললেন, "আছে মনে হচ্ছে।"

"মানিব্যাগটা পৌঁছে দেওয়া যাবে?"

"অবশ্যি পৌঁছে দেওয়া যাবে। তোমার নাম কী খুকি?"

"শিউলি।"

"আর তোমার?" বলে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসার হঠাৎ চমকে উঠলেন, "সে কী! তোমার একী অবস্থা!"

ছেলেটা কিছু বলার আগেই শিউলি বলল, "রিকশায় ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে।"

একজন ট্রাফিক-পুলিশ দাঁত-কিড়মিড় করে বলল, "এই ব্যাটা রিকশাওয়ালাদের যন্ত্রণায় মরেও শান্তি নেই!"

পুলিশ অফিসার বললেন, "এসো আমার সাথে।"

ছেলেটা ভয়ে ভয়ে বলল, "কোথায়?"

"ডাক্তারখানায়।"

ছেলেটা জোরে জোরে মাথা নেড়ে বলল, "লাগবে না। ডাক্তার লাগবে না। আসলে বেশি ব্যথা পাই নাই। খালি একটু রক্ত বের হয়েছে।"

"ঠিক তো?"

"জে। ঠিক। একেবারে ঠিক।"

"বেশ। তা কী নাম বললে?"

ছেলেটা মুখ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলল, "ইয়ে—আমার নাম আজিজ।"

"আজিজ, এখন থেকে রাস্তাঘাটে খুব সাবধান। রিকশায় ধাক্কা খেয়েছ বলে বেঁচে গেছ। যদি এটা ট্রাক হত তা হলে আর দেখতে হত না। আর এই যে ঘুকি তোমাকে মানিব্যাগের জন্যে একটা রিসিট দিয়ে দিই।"

রিসিট নিয়ে শিউলি আবার ছেলেটাকে নিয়ে হাঁটতে থাকে। পুলিশ থেকে খানিকটা দূরে সরে দিয়ে ছেলেটা বলল, "এই মেয়ে—আমার এত কষ্টের রোজগার তুমি পুলিশকে দিয়ে দিলে?"

শিউলি মুখ ভেংচে বলল, "বেশি কথা বললে তোমাকেও পুলিশকে দিয়ে দেব, বুঝেছ?"

ছেলেটা পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, "ইশ! কতগুলি টাকা!" তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, আমি গেলাম।"

"কই যাও আজিজ?"

"আমার নাম আজিজ না।"

শিউলি অবাক হয়ে বলল, "তা হলে পুলিশকে আজিজ বললে যে?"

"পুলিশকে আসল নাম বলে বিপদে পড়ব নাকি?"

"তা হলে তোমার আসল নাম কী?"

"বল্টু।"

"বল্টু? হি হি হি!" শিউলি হাসতে হাসতে বলল, "বল্টু কি কখনো কারও নাম হয়?"

"আমার বাবা গাড়ি মেকানিক ছিল তাই আমার নাম রেখেছিল বল্টু। আমার ছোট বোনের নাম রেখেছিল মোবিল।"

"তোমার বাবা এখন কী করে?"

"জানি না। বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।"

"তোমার বোন?"

বল্টু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "মরে গেছে। তখন একদিন মাও ঘর ছেড়ে চলে গেল।"

"তার মানে তুমি একা? তোমার কেউ নেই?"

বল্টু গম্ভীরমুখে বলল, "ওস্তাদজি আছে।"

"ওস্তাদজি? কিসের ওস্তাদজি?"

"পকেটমারা স্কুলের ওস্তাদজি।'

"তোমার পকেটমারার ওস্তাদজি না থাকলেই ভালো ছিল।"

বল্টু কোনো কথা বলল না। হেঁটে হেঁটে দুজন একটা চৌরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াল। তখন বল্টু আবার বলল, "আমি গেলাম।"

"কোথায় যাবে?"

"দেখি কিছু রুজিরোজগার করা যায় কি না।"

শিউলি ভুরু কুঁচকে বলল, "রুজিরোজগার? কিসের রুজিরোজগার? আবার গিয়ে পকেট মারবে?"

"না হলে কী করব? না খেয়ে থাকব নাকি?"

শিউলি খপ করে বল্টুর ঘাড় ধরে বলল, "আর যদি কোনোদিন পকেট মার একেবারে ঘাড় ভেঙে ফেলব।"

"তা হলে খাব কী?"

"তোমার খাওয়া নিয়ে চিন্তা? আসো, তোমাকে আমি খাওয়াব।"

কাজেই সেদিন বাসায় ফিরে রইসউদ্দিন আবিষ্কার করলেন বল্টু নামের নয়-দশ বছরের শ্যামলামতন উদাস-উদাস চেহারার একটা ছেলে তাঁর বাসায় উঠে এসেছে। শিউলি জানাল ছেলেটা নাকি রিকশার নিচে চাপা পড়ে ব্যথা পেয়েছে। কয়দিন এখানে থেকে একটু সুস্থ হয়েই চলে যাবে।

শিউলি বল্টুকে সাবান দিয়ে ডলে আচ্ছামতন গোসল করিয়ে আনল। বাসায় তার মাপমতো কোনো কাপড় ছিল না বলে মতলুব মিয়ার একটা লুঙ্গি আর রইসউদ্দিনের একটা পাঞ্জাবি পরিয়ে দেওয়া হল। পাঞ্জাবি পরার পর দেখা গেল সেটা তার পায়ের পাতা পর্যন্ত চলে এসেছে, নিচে লুঙ্গি না পরলেও ক্ষতি ছিল না। শিউলি বল্টুর নিজের ময়লা কাপড়জামা ধুয়ে বারান্দায় টানিয়ে দিল শুকানোর জন্যে।

রাত্রে খাবার টেবিলে রইসউদ্দিনের দুই পাশে খেতে বসেছে শিউলি আর বল্টু। মতলুব মিয়ার রান্না মুখে দিয়ে বল্টু হতাশভাবে মাথা নাড়ল, রইসউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে?"

"দুই নম্বুরি রান্না।"

মতলুব মিয়া মেঘস্বরে জিজ্ঞেস করল, "সেটা আবার কী?"

"যেই রান্না মুখে নেওয়া যায় সেইটা এক নম্বুরি, যেইটা মুখে নেওয়া যায় না সেইটা হচ্ছে দুই নম্বুরি।"

শিউলি বলল, "কষ্ট করে খেয়ে নাও। মতলুব চাচা নাকি পঁচিশ বছর ধরে এই রান্না শিখেছে।"

রইসউদ্দিন ভাত খেতে খেতে বল্টুর খোঁজ-খবর নিলেন, মা-বাবা ভাই-বোন কেউ নেই, একেবারে একা থাকে শুনে জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করলেন। পড়াশোনা কিছু করেছে কি না জানতে চাইলে বল্টু বলল, "এমনিতে স্কুলে যাই নাই, কিন্তু ওস্তাদজির কাছে কিছু জিনিসপত্র শিখেছি।"

শিউলি খেতে খেতে বিষম খেল। ওস্তাদজির কাছে কী বিদ্যা শিখেছে ব্যাখ্যা করলে বিপদ হয়ে যাবে। রইসউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, "কী শিখেছ ওস্তাদের কাছে?"

"এই— হাতের কাজ।"

মতলুব মিয়া সরুচোখে বলল, "কীরকম হাতের কাজ?"

বল্টু কিছু বলার আগেই রইসউদ্দিন বললেন, "আজকাল কতরকম এন. জি. ও. আছে, মেয়েদের কাজকর্ম শেখায়, বাচ্চাদের কাজকর্ম শেখায়। ঠোঙা বানানো, টুকরি বানানো এইসব হবে আর কি!"

বল্টু কিছু বলল না, কিন্তু শিউলি জোরে জোরে কয়েকবার মাথা নাড়ল। রইসউদ্দিন বল্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার হাতের কাজ কোথায় দেখাও?"

"আমাদের ওস্তাদের সাগরেদরা একেকজন একেক জায়গায় যাই। কেউ রেলস্টেশন, কেউ বাসস্টেশন। আমি বাসস্টেশনে যাই।"

"কীরকম রোজগারপাতি হয়?"

"ঠিক নাই । কখনো বেশি কখনো কম।" বল্টু হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, "আজকাল মানুষজন পকেটে টাকা-পয়সা নিয়ে বের হয় না।"

রাত্রে খাবারের পর শিউলি পড়তে বসে গেল, তার নাকি অনেক হোমওয়ার্ক বাকি। বল্টুর কিছু করার নেই তাই সে বাসায় ঘুরে বেড়াতে থাকে। বসার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেল ভেতরে রইসউদ্দিনের সাথে মতলুব মিয়া কথা বলছে। বল্টু চলে আসছিল কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল, মনে হল তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। শুনতে পেল মতলুব মিয়া বলছে, "ভাই, আমি লাখ টাকা বাজি ধরতে পারি এই ব্যাটা চোর।"

রইসউদ্দিন বললেন, "এইটুকু মানুষ চোর?"

"চোরের বয়স নাই ভাই, চোরের সাইজও নাই। যারা চোর তারা জন্ম থেকে চোর।"

"কী বলছ বাজে কথা!"

"আমার কথা বিশ্বাস করলেন না? পোলাটার চোখের দৃষ্টি দেখেন নাই?"

"আমার তো এমন কিছু উনিশ-বিশ মনে হল না।"

মতলুব মিয়া ষড়যন্ত্রীর মতো গলা নিচু করে বলল, "একে বাসার মাঝে জায়গা দেবেন না ভাই। সর্বনাশ করে দেবে।"

"কীরকম সর্বনাশ করবে?"

"এদের বড় বড় চোর-ডাকাতের সাথে যোগাযোগ থাকে, রাত্রিবেলা দরজা খুলে সবাইকে নিয়ে আসবে।"

রইসউদ্দিন হোহো করে হেসে বললেন, "আমার বাসায় আছে কী যে চোর-ডাকাত আসবে?"

মতলুব মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, "এইটা হাসির কথা না ভাই। যদি ভালো চান তা হলে এই ছেলেকে বিদায় করেন।"

রইসউদ্দিন বললেন, "ছি ছি! এটা তুমি কী বলছ মতলুব মিয়া! অসুস্থ একটা ছেলে এসেছে, তাকে ঘর থেকে বের করে দেব? শরীর ভালো হলে সে তো নিজেই চলে যাবে।"

"ঠিক আছে, যদি বের করতে না চান তা হলে রাত্রে ঘরে তালা মেরে রাখবেন। ছোটলোকের জাতকে বিশ্বাস নাই।"

রইসউদ্দিন এবারে একটু রেগে উঠে ধমক দিয়ে বললেন, "মতলুব মিয়া, তুমি বড় বাজে কথা বল, এখন যাও দেখি!"

মতলুব মিয়া ঘর থেকে বের হওয়ার আগেই বল্টু দরজা থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তাকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মতলুব মিয়া বিশাল হৈচৈ শুরু করে দিল, "এই ছেলে, তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

বল্টু মিয়া উদাস-উদাস গলায় বলল, "তা হলে কোনখানে থাকব?"

"কত বড় সাহস তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার প্রাইভেট কথাবার্তা শোন।"

বল্টু কিছু বলল না— কী বলবে ঠিক বুঝতেও পারল না। মতলুব মিয়া চিৎকার করে বল্টুর হাত ধরে রইসউদ্দিনের কাছে নিয়ে গেল, "ভাই, বলেছিলাম না এই ছেলে চোরের জাত? এই দেখেন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছে।"

রইসউদ্দিন আমতা আমতা করে বললেন, "শুনলে সমস্যাটা কী?"

"সমস্যা বুঝতে পারছেন না? মাথায় বদ মতলব সেইজন্যে চোরের মতো কথাবার্তা শুনছে।"

মতলুব মিয়ার হৈচৈ চিৎকার শুনে শিউলিও চলে এসেছে, সে একটু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে?"

মতলুব মিয়া বলল, "তুমি কোথা থেকে এই ছেলে ধরে এনেছ? পরিষ্কার চোর।"

শিউলি ঘাবড়ে গেল, ভয়ে ভয়ে বলল, "কী চুরি করেছে?"

"এখনও করে নাই, কিন্তু মনে হয় করবে।" মতলুব মিয়া মুখ শক্ত করে রইসউদ্দিনকে বলল, "ভাই আপনার টাকা-পয়সা মানিব্যাগ সাবধান।"

রইসউদ্দিন মতলুব মিয়াকে একটা কঠিন ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলেন। বল্টু যে-টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে একটু আগে তাঁর মানিব্যাগটা ছিল, এখন নেই। রইসউদ্দিন চমকে উঠে বললেন, "আমার মানিব্যাগ!"

মতলুব মিয়া দুই লাফ দিয়ে বল্টুকে ধরে ফেলল, চিৎকার করে বলল, "বের কর মানিব্যাগ।"

"মানিব্যাগ? কোন মানিব্যাগ?"

মতলুব মিয়া দাঁত-কিড়মিড় করে বলল, "ঢং করবি না ব্যাটা বদমাইশ। তোদেরকে আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি।"

রইসউদ্দিন কিছু বলার আগেই মতলুব মিয়া বল্টুর ঢলঢলে পোশাকের ভেতরে সবকিছু দেখে ফেলেছে, কোথাও মানিব্যাগ লুকানো নেই। টেবিলে, টেবিলের নিচে আশপাশে আবার খুঁজে দেখা হল, মানিব্যাগের কোনো চিহ্ন নেই। রইসউদ্দিন কয়েকবার নিজের পকেট দেখলেন, ভুল করে ড্রয়ারের মাঝে রেখে দিয়েছেন কি না ভেবে ড্রয়ারটা খুলে দেখলেন এবং কোথাও না পেয়ে সত্যি সত্যি খুব দুশ্চিন্তিত হয়ে গেলেন। মাত্র বেতন পেয়েছেন, মানিব্যাগ-ভরা টাকা, তা ছাড়া নানারকম দরকারি কাগজপত্র রয়েছে, এখন এই মানিব্যাগ চুরি হয়ে গেলে তাঁর মহা ঝামেলা হয়ে যাবে।

মতলুব মিয়া মোটামুটি নিশ্চিত ছিল বল্টুর সারা শরীর ভালো করে খুঁজলেই মানিব্যাগটা পাওয়া যাবে, না পেয়ে সেও খুব চিন্তিত হয়ে গেল। শিউলি কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে বল্টুর দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে থাকে। বল্টু উদাস-উদাস চোখে শিউলির দিকে তাকাল এবং হঠাৎ তার চোখে একটা দুষ্টুমির হাসি ঝিলিক মেরে যায়। সাথে সাথে পুরো ব্যাপারটা শিউলির কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। সে মুখ টিপে হেসে এক পা এগিয়ে এসে বলল, "রইস চাচা।"

"কী হল?"

"আপনার মানিব্যাগ তো এই ঘরেই ছিল?"

"হুঁ।"

"চুরি হলে তো এই ঘর থেকেই চুরি হয়েছে?"

"হুঁ।"

"চোর তা হলে এই ঘরেই আছে?"

"কী বলছ তুমি?"

"বলছিলাম কি মতলুব চাচাকে—"

মতলুব মিয়া চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "কী বললে ছেমড়ি? তোমার এত বড় সাহস!"

"আপনার পকেট দেখি!"

মতলুব মিয়া রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে পকেটে হাত দিল এবং হঠাৎ সে একেবারে পাথরের মতো জমে গেল। তার মুখ প্রথমে ছাইয়ের মতো সাদা এবং একটু পরে সেখানে

ছোপ ছোপ লাল এবং বেগুনি রং দেখা গেল। রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, "কী হয়েছে মতলুব মিয়া?"

"আম-আ-আ-আম—"

"আম?"

"আমা-আমার আমার প-প-পকেট—"

"তোমার পকেটে কী?"

"আ-আ-আ-আপনার মানিব্যাগ।"

মতলুব মিয়া সত্যি সত্যি তার পকেট থেকে রইসউদ্দিনের মানিব্যাগ বের করে আনল। রইসউদ্দিন খুব অবাক হয়ে ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মতলুব মিয়া তোতলাতে তোতলাতে বলল, "কে-কে-কেমন করে আ-আ-আমার পকেটে এল!"

রইসউদ্দিন মেঘস্বরে বললেন "মতলুব মিয়া!"

"জে?"

"মানিব্যাগের তো পাখা নাই যে উড়ে উড়ে তোমার পকেটে চলে গেছে! নাকি আছে?"

"নাই।"

"তুমি কী উদ্দেশ্যে এইটা পকেটে ঢোকালে? আর কী উদ্দেশ্যে এই ছেলেটাকে চোর প্রমাণ করার জন্যে এত বস্ত হলে?"

মতলুব মিয়া তোতলাতে লাগল, "ভাই, বি-বি-বিশ্বাস করেন, আ-আ-আমি কিছু জানি না।"

"তোমার পকেটে আমার মানিব্যাগ আর তুমি কিছু জান না?"

"খো-খো-খোদার কসম।"

"তোমার টাকার দরকার থাকে তো আমাকে বললে না কেন? আমার মানিব্যাগ কেন সরিয়ে নিলে?"

"খো-খো-খোদার কসম ভাই।"

"খবরদার মতলুব মিয়া, চুরি-চামারি করে আল্লাহ্ খোদার নাম টানাটানি শুরু কোরো না।"

শিউলি মুখ টিপে হেসে বলল, "আপনি কোনো চিন্তা করবেন না রইস চাচা। আমরা সবসময় মতলুব চাচাকে চোখে-চোখে রাখব, মতলুব চাচা আর চুরি-চামারি করতে পারবে না।"

মতলুব মিয়া বিস্ফারিত চোখে শিউলির দিকে তাকিয়ে রইল। শিউলি বলল, "রাত্রিবেলা মতলুব চাচাকে তালা মেরে রাখলে কেমন হয় রইস চাচা?"

ঘুমানোর সময় শিউলি বল্টুর ঘাড় ধরে বলল, "বল্টু!"

বল্টু ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "ঘাড়ে কেন ধরেছ? শিউলি, ঘাড় ছাড়ো।"

"খবরদার, শিউলি বলবি তো ঘাড় ভেঙে দেব। বল শিউলি আপা।"

"ঘাড় ছাড়ো শিউলি আপা।"

"ছাড়ছি, তার আগে বল— আর কখনো চুরি করবি?"

"কখন চুরি করলাম?"

"এই যে মানিব্যাগ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরালি!"

"সেইটা কি চুরি হল? এইটা করলাম মতলুব চাচাকে টাইট দেওয়ার জন্যে।"

"ঠিক আছে, কিন্তু আর কখনো করবি না।"

"করব না।"

"বল খোদার কসম।"

"খোদার কসম।"

"বল শান্নি পীরের কসম।"

বল্টু কিছু না বলে চুপ করে রইল। শিউলি একটা ধমক দিয়ে বলল, "বল!"

বল্টু বিড়বিড় করে বলল, "শান্নি পীরের কসম।"

"এখন কাছে আয়।" বল্টু কাছে আসতেই শিউলি হ্যাঁচকা টানে তার গলার তাবিজটা ছিঁড়ে নিল। বল্টু প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "আমার তাবিজ!"

"তোর আর এই তাবিজের দরকার নাই বল্টু। তুই আর কোনোদিন চুরি করবি না।"

বল্টু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, এই মেয়েটা সত্যি সত্যি তার এতদিনের ব্যাবসাটার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিল। শান্নি পীরের কসম খেয়ে তাবিজ ছাড়া সে কি আর কখনো পকেট মারতে পারবে? অনেক দুঃখ নিয়ে বল্টু সেই রাতে ঘুমাতে গেল।

৫

একটু সুস্থ হয়েই বল্টু চলে যাবে বলে কথা দিয়েছিল কিন্তু এর মাঝে দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেছে বল্টু চলে যাবার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না। রইসউদ্দিন নিজে থেকে কিছু বলতেও পারেন না, এইটুকুন একটা ছেলেকে তো আর ঘর থেকে বের করে দেওয়া যায় না। ছেলেটা আসায় শিউলির একটা কথা বলার লোক হয়েছে, দুইজনে কুটকুট করে দিনরাত কথা বলে। মেয়েটা অসম্ভব দুষ্ট হলেও ভেতরে কেমন জানি একটা মায়া আছে, মনে হয় ছেলেটাকে একটু আদরও করে। বল্টু বাসায় থাকায় রইসউদ্দিনের আরেকটা লাভ হয়েছে, মতলুব মিয়াকে চোখে-চোখে রাখার একজন মানুষ হয়েছে। পঁচিশ বছর একসাথে থেকে হঠাৎ সে যে চুরি করা শুরু করবে সেটা কে জানত? সবচেয়ে বড় কথা, শিউলির চাচার খোঁজ পাওয়া গেছে, রইসউদ্দিন চিঠি লিখেছেন, আশা করছেন সপ্তাহ দুয়েকের মাঝে চিঠির উত্তর এসে যাবে। চাচা এসে যখন মেয়েটাকে নিয়ে যাবে তখন বল্টু তার নিজের জায়গায় চলে যাবে। ততদিন তাঁর বাসায় এই দুজন নতুন বাচ্চা-অতিথি থাকা এমন কিছু খারাপ ব্যাপার নয়। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে তাঁর যেরকম ভয় ছিল—সত্যি কথা বলতে কী এ দুজনকে দেখে সেই ভয়টা একটু কমেই এসেছে।

আজ অফিস ছুটি। রইসউদ্দিন তাঁর কাগজপত্র ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করার জন্যে বের করে খানিক দূর এগিয়ে এসে হঠাৎ করে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন। শিউলি আর বল্টু বেরিয়ে গেছে—দুজন টো টো করে কোথায় ঘুরে বেড়ায় কে জানে! কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে রইসউদ্দিনের হঠাৎ চা খাওয়ার ইচ্ছে করল। মতলুব মিয়াকে ডেকে তাই এক কাপ চা দিয়ে যেতে বললেন।

মতলুব মিয়া কাপে করে যে-জিনিসটা চা হিসেবে নিয়ে এল সেটা দেখে অবিশ্যি রইসউদ্দিনের চা খাওয়ার ইচ্ছে পুরোপুরি উবে গেল। ময়লা কাপে ঘোলা খানিকটা তরল, তার মাঝে গোটা ছয়েক নানা আকারের পিঁপড়া ভাসছে। পিঁপড়াগুলো সরিয়ে চায়ে একটু

চুমুক দিয়ে তাঁর নাড়ি উলটে এল। থু থু করে ফেলে বললেন, "এইটা কী এনেছ মতলুব মিয়া? চা, নাকি ইঁদুর মারার বিষ?"

মতলুব মিয়া মুখ গম্ভীর করে বলল, "ভাই, পঁচিশ বছর থেকে আপনার জন্যে জীবনপাত করেছি, এখন আর না।"

রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, "কেন? কী হয়েছে?"

"বাসার কাজ আর করব না।"

রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, "বাসার কাজ তুমি কবে করেছ? গত পঁচিশ বছর তো তুমি শুধু শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলে। শিউলি আসার পর মনে হয় গতরটা একটু নাড়াচ্ছ।"

মতলুব মিয়া মুখ শক্ত করে বলল, "এই অপমান আর সহ্য করব না ভাই, স্বাধীন কাজ করব।"

"কী কাজ?"

"ব্যাবসা।"

রইসউদ্দিন চোখ কপালে তুলে বললেন, "ব্যাবসা! তুমি ব্যাবসা করবে?"

"কেন ভাই? আপনি কি মনে করেন আমি ব্যাবসা করতে পারি না?"

রইসউদ্দিন গম্ভীরমুখে মাথা নাড়লেন, "আমি তাই মনে করি মতলুব মিয়া । তোমার মতো আলসে মানুষ ব্যাবসা করতে পারে না। তুমি কিসের ব্যাবসা করবে?"

মতলুব মিয়ার মুখে সবজান্তার মতো একটা হাসি ফুটে ওঠে। সে মাথা নেড়ে বলল, "তার আগে ভাই বলেন দেখি একটা ময়না পাখির দাম কত?"

"ময়না পাখি? সে তো অনেক দাম, কয়েক হাজার তো হবেই।"

"ময়না পাখি তো দেখতে সুন্দর না কিন্তু তার দাম বেশি, কারণটা কী বলেন দেখি?"

"কারণ ময়না পাখি কথা বলে।"

"এখন যদি মনে করেন অন্য কোনো পাখি কথা বলে তবে সেই পাখির দাম কত হবে?"

রইসউদ্দিন অবাক হয়ে মতলুব মিয়ার দিকে তাকালেন, "তুমি যদি কথা-বলা কাক আনতে পার লাখ টাকায় বিক্রি হবে। যদি মুরগিকে দিয়ে কথা বলাতে পার সেইটাও নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিকরা লাখ দুইলাখ টাকায় কিনে নেবে।"

মতলুব মিয়ার চোখ লোভে চকচক করতে থাকে, "সত্যি? সত্যি ভাই?"

রইসউদ্দিন মাথা নেড়ে বললেন, "কিন্তু তুমি কী পাখি আনবে যেটা কথা বলে?"

মতলুব মিয়া উত্তর না দিয়ে খুব গম্ভীর গলায় বলল, "সময় হলেই দেখবেন ভাই। এখন খালি আমার দরকার একটু ক্যাশ টাকা। ধার দিবেন কিন্তু ভাই।"

রইসউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, "দেওয়ার মতো হলে নিশ্চয়ই দেব কিন্তু কথা হচ্ছে তোমার যেরকম বুদ্ধিশুদ্ধি তোমাকে কেউ-না ঠকিয়ে দেয়!"

মতলুব মিয়া একগাল হেসে বলল, "ভাই, একজন মানুষকে আরেকজন মানুষ ঠকাতে পারে যদি তার বুদ্ধি বেশি হয়। এইখানে মক্কেলের বুদ্ধি আমার থেকেও কম । হে হে হে!"

সেদিন সন্ধেবেলা দেখা গেল মতলুব মিয়া একটা খাঁচা নিয়ে এসেছে, খাঁচাটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা। অনেক যত্ন করে সেটাকে তার ঘরে টেবিলের উপর রাখা হল। রইসউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, "কী আছে ভেতরে?"

মতলুব মিয়া গম্ভীরমুখে বলল, "সময় হলেই দেখবেন।"

"কখন সময় হবে?"

"রাত বারোটায়।"

"রাত বারোটায়? রাত বারোটায় কেন?"

"পাখিদের খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম খুব নিয়মমতো নিতে হয়। একটু উলটা-পালটা হলেই বিপদ।"

শিউলি জিজ্ঞেস করল, "এর ভিতরে পাখি আছে?"

"হুঁ।"

"এই পাখি কথা বলে?"

মতলুব মিয়া উত্তর না দিয়ে খুব একটা তাচ্ছিল্যের ভান করে শিউলির দিকে তাকাল।

সকালে উঠে স্কুলে যেতে হয় বলে শিউলিকে রাত দশটার মাঝে শুয়ে পড়তে হয়। বল্টুকে এখনও স্কুলে দেওয়া হয়নি কিন্তু একা একা জেগে না থেকে সেও শুয়ে পড়ে। তবে আজকে কথা-বলা পাখি দেখার জন্যে রইসউদ্দিন, শিউলি এবং বল্টু তিনজনই জেগে রইল। ঠিক রাত বারোটার সময় মতলুব মিয়া এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি, একটা পিরিচে করে কিছু চাউল এবং একটা মোমবাতি নিয়ে হাজির হল। টেবিলে মোমবাতিটা জ্বালিয়ে সে ঘরের লাইট নিভিয়ে দিল। বল্টু জিজ্ঞেস করল, "লাইট থাকলে কী হয়?"

মতলুব মিয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ-স-স-স কোনো শব্দ না। এই পাখিকে জাগানোর সময় কড়া আলো কড়া শব্দ থাকতে পারবে না।"

রইসউদ্দিন, শিউলি এবং বল্টু তিনজনই নিশ্বাস বন্ধ করে রইল এবং মতলুব মিয়া খুব সাবধানে কালো কাপড়টি সরিয়ে নিল। তারা অবাক হয়ে দেখল খাঁচার মাঝখানে একটা মাঝারি সাইজের মুরগি বসে আছে। কথা বলা নিষেধ জেনেও শিউলি অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল, "আরে! এইটা দেখি মুরগি!"

মতলুব মিয়া চোখ পাকিয়ে শিউলির দিকে তাকিয়ে বলল, "চুপ!"

শিউলি চুপ করে যাবার পর মতলুব মিয়া গ্লাস থেকে ঠাণ্ডা পানি নিয়ে মুরগির গায়ে ছিটিয়ে দিতেই মুরগি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। মতলুব মিয়া তখন হাতে কয়টা চাউল নিয়ে খাঁচার দরজা দিয়ে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল, কিন্তু মুরগি সেটা খাবার কোনো উৎসাহ দেখাল না, খাঁচার এক কোনায় সরে গেল। মতলুব মিয়া বলল, "খাও জরিনা একটু চাউল খাও।"

বল্টু জিজ্ঞেস করল, "মুরগি কথা বুঝতে পারে?"

"হ্যাঁ।" মতলুব মিয়া মাথা নাড়ল, "মুরগি বোলো না, মনে দুঃখু পাবে। নাম জরিনা।"

"মুরগির নাম জরিনা?"

"হ্যাঁ। সব কথা বলতে পারে।" মতলুব মিয়া মুরগির দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বলল, "বলো জরিনা, নাম বলো।"

সবাই কানখাড়া করে রইল, মুরগি কোনো শব্দ করল না। মতলুব মিয়া গলায় মধু ঢেলে বলল, "বলো জরিনা সুন্দরী! লজ্জা কোরো না।"

মুরগি এবারে কক কক করে একটু শব্দ করল। বল্টু হাততালি দিয়ে বলল, "বলেছে! নাম বলেছে।"

শিউলি মাথা নেড়ে বলল, "নাম বলেছে কক কক । জরিনা তো বলে নাই।"

রইসউদ্দিন এতক্ষণ একটা কথাও না বলে চুপ করে পুরো ব্যাপারটা দেখছিলেন। এবারে গলা-খাঁকারি দিয়ে বললেন, "মতলুব মিয়া!"

"জে?"

"আসলেই তোমার মুরগি কথা বলে?"

"জে ভাই।"

"তোমার নিজের কানে শুনেছ?"

'জে। নিজের কানে শুনেছি।"

"কী কথা বলেছে?"

"নাম জিজ্ঞেস করলে বলে জরিনা সুন্দরী। বাড়ি জিজ্ঞেস করলে বলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া।"

"ব্রাহ্মণবাড়িয়া?" রইসউদ্দিন চোখ কপালে তুলে বললেন, "একটা মুরগি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বলতে পারে? এত কঠিন একটা শব্দ?"

মতলুব মিয়া গম্ভীর গলায় বলল, "ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুরগি তো বাড়ি নেত্রকোনা বলতে পারে না।"

"আর কী কী কথা বলে?"

"আলুর পাতা থালু থালু কবিতাটা বলতে পারে।"

"পুরো কবিতাটা বলে?"

"জে।"

রইসউদ্দিন নিশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন। মতলুব মিয়া বলল, "অনেক পাছড়াপাছড়ি করলে গানও গাইতে পারে।"

"গানও গাইতে পারে? কী গান?"

"রঙিলা ভাবি গো— তবে গানের গলা বেশি ভালো না।"

"তুমি নিজের কানে শুনেছ?"

"জে। আপনি শুনবেন ভাই?"

"শোনাও দেখি।"

মতলুব মিয়া খাঁচার সামনে উবু হয়ে বলল, "জরিনা সুন্দরী! একটা গান শোনাও দেখি আমাদের! রঙিলা ভাবির গান! শোনাও। শোনও দেখি—"

মুরগির গান শোনানোর কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মতলুব মিয়া খাঁচা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "শোনাও একটা গান। ভালো হবে না কিন্তু! অনেক রাগ হব কিন্তু! শোনাও গান।"

মুরগি খানিকটা ভয় পেয়ে মাথা উঁচু করে কঁক কঁক করে একবার শব্দ করল। মতলুব মিয়া এবারে সত্যি সত্যি রেগে গেল, খাঁচাটা জোরে জোরে কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "কথা বল বেটি। বল কথা, না হলে এক আছাড় দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেব, আবাগীর বেটি। মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব কিন্তু—"

রইসউদ্দিন একটা হাই তুলে বললেন, "মতলুব মিয়া, তোমাকে বোকা পেয়ে কেউ-একজন ঠকিয়ে দিয়েছে। মুরগি কোনোদিন কথা বলে না। মুরগি যদি কথা বলত তা হলে তুমিও আইনস্টাইন হয়ে যেতে।"

মতলুব মিয়া কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "কিন্তু আমি নিজের কানে কথা বলতে শুনেছি!"

"কী শুনেছ, কীভাবে শুনেছ আমি জানি না—কিন্তু আমার কাছ থেকে তুমি শুনে রেখো, তোমার বুদ্ধি আর ঐ মুরগির বুদ্ধির মাঝে বিশেষ পার্থক্য নাই।"

রইসউদ্দিন ঘুমাতে চলে গেলেন। শিউলি আর বল্টু মতলুব মিয়ার সাথে আরও ঘণ্টাখানেক মুরগিকে কথা বলানোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিল। মতলুব মিয়া হাল ছাড়ল না, সারারাত মুরগির পেছনে লেগে রইল। শেষরাতে রইসউদ্দিনের ঘুম যখন একটু হালকা হয়ে এল, শুনতে পেলেন মতলুব মিয়া ভাঙা গলায় কাকুতি-মিনতি করছে, "তোর দোহাই লাগে জরিনা বেটি— তোর পায়ে ধরি জরিনা— একটা কথা বল। বেশি লাগবে না, মাত্র একটা শব্দ! মাত্র একটা শব্দ! বল আবাগীর বেটি! বল সোনার চান আমার পিঞ্জিরার পক্ষী! বল একবার! চেষ্টা করে দেখ, আমি জানি তুই পারবি। পাঁচশো টাকা দিয়ে তোরে কিনে এনেছি—আমারে তুই পথে বসাবি না। আল্লাহর কসম লাগে—"

সকালবেলা অফিসে যাওয়ার আগে রইসউদ্দিন দেখলেন মতলুব মিয়া মুরগির খাঁচাটিকে সামনে নিয়ে বারান্দায় গালে হাত দিয়ে বসে আছে, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি এবং চোখ টকটকে লাল। মতলুব মিয়ার অবস্থা দেখে রইসউদ্দিন তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। শিউলি স্কুলে যাবার সময় দেখল মতলুব মিয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। দুপুরবেলা বল্টু যখন হাঁটতে বের হল মতলুব মিয়া তখনও তার মুরগির খাঁচার সামনে বসে আছে।

বিকেলবেলা বাসায় ফিরে এসে রইসউদ্দিন একটা বিচিত্র জিনিস দেখতে পেলেন— ঘরের পিলারের সাথে একটা আট-দশ বছরের ছেলে দড়ি দিয়ে বাঁধা। তার সামনে মতলুব মিয়া শিউলি এবং বল্টুকে নিয়ে বসে আছে। মতলুব মিয়ার চেহারা আনন্দে ঝলমল করছে, রইসউদ্দিনকে দেখে সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, "ভাই কেস কমপ্লিট।"

"কিসের কেস কমপ্লিট? আর এই ছেলে কে? দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছ কেন?"

"পালিয়ে যেন না যায়।"

"পালিয়ে কোথায় যাবে? কী করেছে এই ছেলে?"

"এই হচ্ছে মুরগির ব্যাপারী।"

"যার কাছ থেকে তুমি কথা-বলা মুরগি কিনেছ?"

"জে।"

রইসউদ্দিন অবাক হয়ে সাত-আট বছরের মুরগি-ব্যাপারীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। গায়ের রং নিশ্চয়ই একসময় ফরসা ছিল, এখন রোদে পুড়ে বাদামি হয়ে গেছে। চোখ দুটি চকচক করছে, দেখলেই মনে হয় এর পেটে পেটে অনেক বুদ্ধি। রইসউদ্দিন বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি মতলুব মিয়াকে মুরগি বিক্রি করেছ?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল।

"তুমি নাকি বলেছ তোমার মুরগি কথা বলে?"

ছেলেটা আবার মাথা নাড়ল। রইসউদ্দিন বললেন, "মুরগি তো কখনো কথা বলে না।"

ছেলেটা কোনো কথা না বলে ঠোঁট ওলটাল।

মতলুব মিয়া এগিয়ে এসে বলল, "তুই মুরগিকে আবার কথা বলাতে পারবি? ছেড়ে দেব তা হলে। পারবি?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল। মতলুব মিয়া তখন ঘরের ভেতর থেকে মুরগির খাঁচাটা নিয়ে এল, ছেলেটার সামনে রেখে বলল, "নে । কথা বল।"

ছেলেটা এই প্রথম কথা বলল, "আমাকে আগে ছেড়ে দাও।"

মতলুব মিয়া মুখ শক্ত করে বলল, "আগে কথা বল।"

রইসউদ্দিন ধমক দিয়ে বললেন, "দড়ি খুলে দাও মতলুব মিয়া । একজন মানুষকে আবার বেঁধে রাখে কেমন করে?"

মতলুব মিয়া বিরসমুখে ছেলেটার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ছেলেটা হাতে হাত বুলাতে বুলাতে মুরগির খাঁচার কাছে এগিয়ে গেল। মাথা নিচু করে মুরগিটাকে জিজ্ঞেস করল, "এই, তোর নাম কী?"

মুরগিটা মাথা উঁচু করে ছেলেটার দিকে তাকাল, কিছু বলল না। ছেলেটা খাঁচা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কী নাম?"

সাথে সাথে সবাই স্পষ্ট শুনল মুরগিটা বলল, "জ-রি-না।"

ছেলেটা উঠে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মতলুব মিয়া হাতে কিল দিয়ে বলল, "শুনেছেন ভাই? শুনেছেন?"

রইসউদ্দিন হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শিউলি আর বল্টু খাঁচার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "নাম কী? নাম কী তোর?"

মুরগিটা বারকয়েক কঁক কঁক করে হঠাৎ আবার স্পষ্ট গলায় বলল, "জ-রি-না সু-ন্দ-রী!"

শিউলি আর বল্টু লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

রইসউদ্দিন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, হঠাৎ করে তাঁর মনে হল তিনি ব্যাপারটা খানিকটা বুঝতে পেরেছেন। তাঁর মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে, এইটুকু ছেলে—কিন্তু কী ধুরন্ধর! ছেলেটা মতলুব মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি যাই।"

রইসউদ্দিন বললেন, "দাঁড়াও ছেলে।"

ছেলেটা শঙ্কিতমুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। রইসউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

"কুকন।"

"কুকন? কুকন কি কারও নাম হয়? নিশ্চয়ই তোমার নাম খোকন। তাই না?"

ছেলেটা মাথা নাড়ল। রইসউদ্দিন বললেন, "তুমি নিজের নামটাও ঠিক করে উচ্চারণ করতে পার না আর এরকম ভেন্ট্রিলোকুইজম কেমন করে শিখলে?"

ছেলেটা মাথা ঘুরিয়ে রইসউদ্দিনের দিকে তাকাল। রইসউদ্দিন বললেন, "ভেন্ট্রিলোকুইজম মানে জান? মুখ না নাড়িয়ে কথা বলা যেন মনে হয় অন্য কেউ কথা বলছে।"

মতলুব মিয়া হঠাৎ চোখ বড় বড় করে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল,"কী? কী বলছেন ভাই?"

"তোমার মুরগি কখনো কথা বলে নাই মতলুব মিয়া । কথা বলে খোকন, মনে হয় বলছে মুরগি। তাই যখন খোকন আশেপাশে থাকে না তখন তোমার মুরগিও কথা বলে না।" রইসউদ্দিন খোকনের দিকে তাকালেন, বললেন, "তাই না খোকন?"

খোকনের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে হঠাৎ উঠে একটা দৌড় দেবার চেষ্টা করল কিন্তু তার আগেই মতলুব মিয়া তাকে জাপটে ধরে ফেলেছে। শুধু যে ধরেছে তাই

নয় নাকেমুখে কিল-ঘুসি মারা শুরু করেছে। রইসউদ্দিন, শিউলি আর বল্টু একসাথে ছুটে গিয়ে খোকনকে মতলুব মিয়ার হাত থেকে ছুটিয়ে নিল। শিউলি আর বল্টু মিলে মতলুব মিয়াকে ধরে রাখতে পারল না, রাগে ফোঁসফোঁস করে সে হাত-পা নেড়ে চিৎকার করতে করতে বলল, "ব্যাটা বদমাইশ, জোচ্চুর। ঠগের বাচ্চা ঠগ। চোরের বাচ্চা চোর । হারামখোরের বাচ্চা—"

রইসউদ্দিন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, "মতলুব মিয়া, খবরদার ঘরের মাঝে আজেবাজে কথা বলবে না। এইটুকুন একটা ছেলের গায়ে হাত তোল, তোমার লজ্জা করে না? আরেকবার করেছ কি তোমাকে আমি পুলিশে দেব।"

মতলুব মিয়া গজগজ করতে লাগল, রইসউদ্দিন তখন খোকনকে পরীক্ষা করলেন। নাকে বেকায়দা ঘুসি লেগে খানিকটা রক্ত বের হয়ে এসেছে, রুমাল দিয়ে মুছে মুখ ধুইয়ে দেওয়া হল। বল্টু মগে করে পানি এনে তার মুখ ধুয়ে দিল। শিউলি একগ্লাস লেবুর শরবত তৈরি করে নিয়ে এল। শরবত খেয়ে একটা ঢেকুর তুলে খোকন বলল, "আমি গেলাম।"

মতলুব মিয়া প্রায় আর্তনাদ করে বলল, "আমার টাকা!"

বল্টু দাঁত বের করে হেসে বলল, "তোমার টাকা গেছে মতলুব চাচা।"

শিউলি খোকনের ঘাড়ে থাবা দিয়ে বলল, "কই যাবি? আজ রাতটা আমাদের সাথে থেকে যা।"

"থেকে যাব?"

"হ্যাঁ। তুই কেমন করে ভেন্টি-কুন্টি করিস আমাদের দেখা—"

রইসউদ্দিন হেসে বললেন, "শব্দটা ভেন্টি-কুন্টি না। শব্দটা ভেন্ট্রিলোকুইজম।"

শিউলি কয়েকবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, "ঐ একই কথা।"

বল্টু রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "চাচা। খোকন আজ রাতে এখানে থাকুক?"

রইসউদ্দিন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে থাকুক।"

রাত্রিবেলা জরিনা সুন্দরীকে কেটেকুটে রান্না করা হল, মতলুব মিয়ার রান্না—খুব যে ভালো হল তা বলা যাবে না, কিন্তু সবাই খেল খুব তৃপ্তি করে। সবচেয়ে মজা হল খাবার পর, যখন সবার পেটের ভেতর থেকে জরিনা সুন্দরী কথা বলতে শুরু করল! হেসে সবাই কুটিকুটি হয়ে গেল খোকনের কাণ্ড দেখে।

৬

পরদিন ভোরবেলা খোকনের চলে যাবার কথা। সারারাত ভেন্ট্রিলোকুইজম শুনে শুনে ঘুমাতে অনেক রাত হয়েছে তাই ঘুম থেকে উঠতে সবারই খানিকটা দেরি হল। ঘুম ভাঙতে আরও দেরি হত কিন্তু বিদেশ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসে একটা চিঠি এসেছে, সেই লোক দরজা ধাক্কাধাক্কি করে রইসউদ্দিনের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

খাম খুলে রইসউদ্দিন চিৎকার করে শিউলিকে ডাকাডাকি করতে লাগলেন, ভেতরে আমেরিকা থেকে তার ছোট চাচার চিঠি। রইসউদ্দিনকে আমেরিকা থেকে শিউলির ছোট চাচা বিশাল চিঠি লিখেছেন। তিনি খবর পেয়েছিলেন তাঁর ভাই সপরিবারে নৌকাডুবি হয়ে

মারা গেছে, শিউলি যে বেঁচে গিয়েছে সেটা তিনি জানতেন না। রইসউদ্দিন যে শিউলিকে দেখেশুনে রাখছেন সেজন্যে ছোট চাচা সারা চিঠিতে কম করে হলেও একশো বার তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। ছোট চাচা আমেরিকা থেকে এসে শিউলিকে নিয়ে যাবেন, ভিসার কীসব ব্যাপার আছে সেজন্যে যেটুকু দেরি হবে, তার বেশি একদিনও অপেক্ষা করবেন না। ছোট চাচা লিখেছেন শিউলিকে দেখেশুনে রাখতে রইসউদ্দিনের নিশ্চয়ই খরচপাতি হচ্ছে, সেজন্যে তিনি এক হাজার ডলার পাঠালেন। টাকাটা পাঠাতে তাঁর খুব লজ্জা হচ্ছে, কারণ রইসউদ্দিন যে-মানবিক কাজটুকু করেছেন সেটা নিশ্চয়ই টাকা দিয়ে তুলনা করা যায় না।

চিঠির ভেতরে ছোট চাচার কয়েকটা ছবি। তাঁর স্ত্রী বিদেশী হাসিখুশি একজন আমেরিকান মহিলা, দুজন ছেলেমেয়ে। ছোট চাচার বয়স বেশি নয়, ছবিতে দেখা যাচ্ছে বরফের মাঝে ছেলেমেয়েকে আঁকড়ে ধরে বসে আছেন। চিঠিতে শিউলির কয়েকটা ছবি পাঠানোর জন্য বলেছেন।

রইসউদ্দিন ছোট চাচার চিঠি নিয়ে শিউলিকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন । শিউলি একটু ভয় পেয়ে বলল, "কী হয়েছে চাচা?"

"তোমার ছোট চাচার চিঠি এসেছে।"

শিউলি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, "সত্যি?"

"হ্যাঁ। এই দেখো ছবি।"

শিউলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবি দেখল। তার বিদেশী চাচি কী কাপড় পরে আছেন, তার চাচতো ভাইবোনরা দেখতে কেমন, তার চাচার গায়ের রং কি আরও ফরসা হয়েছে, বরফটা কি একেবারে ধবধবে সাদা, পেছনের গাছে কোনো পাতা আছে কি না—এই ব্যাপারগুলো নিয়ে লম্বা-চওড়া আলোচনা হল। একটা ছবি যে এত যত্ন করে দেখা যায় সেটা রইসউদ্দিন জানতেন না।

শিউলির চ্যাঁচামেচি শুনে বল্টু আর খোকনও ঘুম থেকে উঠে গেছে। তাদের কাছে শিউলি তার ছোট চাচার গল্প করল। আর কিছুদিনের মাঝেই যে ছোট চাচা তাকে আমেরিকা নিয়ে যাবেন আর সে তখন শুধু টিকিস টিকিস করে ইংরেজি বলবে কথাটা সে তাদেরকে কয়েকবার শুনিয়ে দিল। ছোট চাচা তার খরচের জন্যে এক হাজার ডলার পাঠিয়েছেন শুনে শিউলির চোখ বড় বড় হয়ে গেল, এক হাজার ডলার বাংলাদেশী টাকায় কত টাকা সেটা হিসেব করে বের করে বল্টু, খোকন আর শিউলির প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। ছোট চাচা শিউলির ছবি চেয়েছেন শুনে সাথে সাথেই সেটা কীভাবে করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়ে গেল। বল্টু বলল, "বড় রাস্তার মোড়ে ফটো স্টুডিও আছে। সেখানে গেলেই ছবি তুলে দেবে।"

খোকন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, পেছনে সুন্দর সুন্দর সিনারি থাকে। পানির ফোয়ারা, হরিণ। ফটো তুললে মনে হয় সত্যি সত্যি পানির ফোয়ারার সামনে, হরিণের সামনে ফটো তুলেছে।"

বল্টু বলল, "ফটো তোলার জন্য টাই ভাড়া পাওয়া যায়।"

শিউলি হিহি করে হেসে বলল, "দূর গাধা! আমি মেয়েমানুষ টাই দিয়ে কী করব?"

রইসউদ্দিন বললেন, "একটা ক্যামেরা থাকলে ভালো হত। তা হলে সুন্দর সুন্দর ছবি তোলা যেত।"

শিউলি জিজ্ঞেস করল, "আপনার ক্যামেরা নাই চাচা?"

রইসউদ্দিন মাথা নাড়লেন, "নাহ্।"

হঠাৎ শিউলির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, "চাচা! ছোট চাচা আমেরিকা থেকে যে-টাকা পাঠিয়েছেন সেটা দিয়ে একটা ক্যামেরা কিনে ফেলেন।"

রইসউদ্দিন হেসে ফেললেন, বললেন, "ঠিক আছে! তোমার চাচার টাকাটা তোমার জন্যেই থাকুক, একটা ক্যামেরা আমিই কিনে ফেলি। বাসায় একটা ক্যামেরা থাকা খারাপ না।"

শিউলি, বল্টু আর খোকন আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

খোকনের রাতটা কাটিয়েই চলে যাবার কথা ছিল কিন্তু ক্যামেরা কেনা এবং সেটা দিয়ে শিউলির ছবি তোলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে থেকে যাওয়া ঠিক করল। ক্যামেরা জিনিসটা সে দূর থেকে দেখেছে কিন্তু কীভাবে ছবি তোলা হয় সেটা কখনো দেখেনি।

তিনজনকে নিয়ে রইসউদ্দিন স্টেডিয়াম মার্কেটে গেলেন, সেখানে দরদাম করে শেষ পর্যন্ত একটা ভালো ক্যামেরা কিনলেন। এখন বাকি রইল শিউলির ছবি তোলা। স্টেডিয়ামের সামনে এক জায়গায় শিউলিকে দাঁড় করানো হল, ক্যামেরা চোখে লাগিয়ে যেই ক্লিক করবেন তখন বল্টু বলল, "একটা নতুন জামা হলে ভালো হত।"

রইসউদ্দিন থেমে গেলেন, সত্যিই তাই। তিনি পুরুষমানুষ, সারাজীবন বাচ্চাকাচ্চা থেকে একশো হাত দূরে থেকেছেন, তাদের জামাকাপড় খেয়াল করে দেখেননি। শিউলির রং-ওঠা বিবর্ণ ফ্রকটা দেখে মনে হল সত্যিই এই মেয়েটার একটা নতুন কাপড় হলে চমৎকার হত। শিউলির ছোট চাচা এতগুলো টাকা পাঠিয়েছেন, এখন তার জন্যে তো নতুন জামা-জুতো কেনাই যায়।

রইসউদ্দিন তখন আবার স্কুটারে চেপে শিউলি, বল্টু আর খোকনকে নিয়ে এলেন এলিফেন্ট রোডে । বাচ্চাদের কাপড়ের দোকান ঘুরে ঘুরে শিউলির জন্যে কাপড়জামা কিনলেন । সাথে আরও দুটি বাচ্চা—তাদের জন্যেও কিনতে হয় কাজেই বল্টু আর খোকনের জন্যেও প্যান্টশার্ট আর জুতো কেনা হল। রইসউদ্দিন বহুদিন জামাকাপড় কেনেননি, বাচ্চাকাচ্চার কাপড় তো একেবারেই কেনেননি, খুব অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন খুব কম দামে বাচ্চাদের জন্যে ভারি সুন্দর সুন্দর জামাকাপড় পাওয়া যায়। দোকানে দোকানে ঘুরে ঘুরে জামাকাপড় কিনতে গিয়ে সবার খিদে লেগে গেল, রইসউদ্দিন তখন সবাইকে নিয়ে গেলেন ফাস্ট ফুডের দোকানে। পেট ভরে হ্যামবার্গার আর পেপসি খেল সবাই।

নতুন জামাকাপড় পরার পর সবার চেহারা একেবারে পালটে গেল । রইসউদ্দিন অবাক হয়ে আবিষ্কার করলেন শিউলি মেয়েটির আসলে অপূর্ব মনকাড়া চেহারা, বল্টু এবং খোকনকেও আর পথেঘাটে ঘুরে-বেড়ানো ভানপিটে বাচ্চাদের মতো লাগছে না। তিনজনকে নিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন একজন ফিরিওয়ালা রইসউদ্দিনকে থামিয়ে বলল, "স্যার, বাচ্চাদের ভালো বই আছে, বই নিবেন? আপনার ছেলেমেয়ের জন্যে নিয়ে নেন।" রইসউদ্দিন তখন চমকে উঠে তিনজনের দিকে তাকালেন। তাদের দেখে সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে যে তিনি একজন বাবা, ছুটির দিনে তাঁর তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছেন।

নতুন ক্যামেরা নিয়ে শিউলির ছবি তুলতে গিয়ে দেখা গেল পথেঘাটে ছবি তোলা খুব সহজ নয় । ঠিক ছবি তোলার সময় কোনো-একজন মানুষ ক্যামেরার সামনে হেঁটে চলে আসে। শিউলির তিনটি ছবি তুললেন রইসউদ্দিন, একটার মাঝে একজন ভিখিরি, একটার

মাঝে একজন ফিরিওয়ালা, আরেকটার মাঝে একটা ছাগল ঢুকে গেল। বল্টু তখন বলল, "এক কাজ করলে হয়।"

"কী কাজ?"

"শিশুমেলা চলে গেলে হয়।"

"শিশুমেলা?" রইসউদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, "সেটা কী জিনিস?"

বল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, "ফাটাফাটি জায়গা। নাগর দোলা আছে। ভূতের ট্রেন আছে। ছবি তোলার জন্যে একেবারে ফাস ক্লাস জায়গা।"

শিউলি রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলেন সেখানে যাই।"

রইসউদ্দিন বললেন, "ঠিক আছে, চলো যাই। বের যখন হয়েছি সবকিছু দেখে আসি।"

সবাই আবার স্কুটারে চেপে চলে এল শিশুমেলায়। টিকেট কেটে ভেতরে ঢুকে চারদিকে শিশুদের হৈচৈ আনন্দ দেখে শিউলি, বল্টু আর খোকনের প্রায় মাথা-খারাপ হওয়ার মতো অবস্থা। তিনজনে যখন আনন্দে ছোটাছুটি করছে তখন রইসউদ্দিন তাদের কয়েকটা ছবি নিলেন। মেলায় বাচ্চাদের আনন্দ করার নানা কিছু রয়েছে, কেন এইসব বিদঘুটে কাজ করে বাচ্চারা আনন্দ পায় সেটা নিয়ে রইসউদ্দিনের মনে প্রশ্ন ছিল, কিন্তু চোখের সামনে সেটা দেখে অবিশ্বাস করবেন কী করে? ছোট বাচ্চাদের সাথে বোকার মতো একজন বড় মানুষ একটার মাঝে উঠে পড়েছিল, একটা চেয়ারের মতো জায়গা—সেটাকে উপরে-নিচে এবং ডানে-বাঁয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ঘোরাতে থাকে। তার ভেতরে বাচ্চাগুলো আনন্দে এবং বয়স্ক মানুষটি আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে—রইসউদ্দিন দেখলেন বারকয়েক ঝাঁকুনি খেয়ে বয়স্ক মানুষটি হঠাৎ হড়হড় করে বমি করে দিল কিন্তু ছোট বাচ্চাদের আনন্দের এতটুকু ঘাটতি হল না।

নাগরদোলা চেপে, রাইডে চড়ে, নৌকায় উঠে, ভিডিও গেম খেলে, ট্রেন চেপে ছোটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত তিনজন ক্লান্ত হয়ে পড়ল। রইসউদ্দিন তাদের সাথে কিছুই করেননি কিন্তু তিনজনের পেছনে পেছনে ঘুরে আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে গেলেন। মেলার মাঝে এক কোনায় খাবারের দোকান, সেটা দেখে একসাথে সবার খিদে পেয়ে গেল। বাইরে বেঞ্চে বসে সবাই হট প্যাটিস আর পেপসি খেল।

খেতে খেতে আড়চোখে তাকিয়ে শিউলি দেখল তাদের পাশেই একটা বাচ্চা বসেছে, বাচ্চাটি ভীষণ মোটা। একপাদা খাবার নিয়ে কপাকপ করে খাচ্ছে, তখন পাশে বসে-থাকা মা বললেন, "আর খাসনে বাবা।"

ছেলেটা খাবার-মুখে চিবুতে চিবুতে বলল, "কেন খাব না?"

"পেটের মাঝে ভুটভাট করবে।"

"যাও!' বলে বাচ্চাটা তার মায়ের কথা উড়িয়ে দিয়ে আবার গবগব করে খেতে লাগল।

খোকন হঠাৎ মাথা এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, "দেখ মজা।"

সাথে সাথে হঠাৎ সবাই স্পষ্ট শুনল ছেলেটার পেট বিকট শব্দে ডেকে উঠল। মা বললেন, "ঐ দেখ তোর পেট কেমন শব্দ করছে।"

ছেলেটা পেটে একটা চাঁটি মারতেই শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ যেতে আবার পেটের ভেতর বিকট শব্দ, এবারে আগের থেকেও জোরে। তার মা বললেন, "আর খাসনে বাবা!"

ছেলেটা আবার পেটে একটা চাঁটি মারল, সাথে সাথে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু প্রায় সাথে সাথেই আবার আরও বিকট শব্দে পেট ডেকে উঠল। ছেলেটা এবারে কেমন যেন সতর্ক হয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, "আর খাব না মা। চলো বাড়ি যাই। পেটের ভেতর কেমন জানি করছে।"

ছেলেটা আর তার মা উঠে যাবার সাথে সাথেই শিউলি, বল্টু আর খোকন হিহি করে হাসতে শুরু করল, তাদের হাসি আর থামতেই চায় না। কাছেই রইসউদ্দিন বসেছিলেন, তিনি বুঝতেই পারলেন না কী এমন হাসির ব্যাপার হয়েছে।

রাতে বাসায় ফিরে আসার সময় স্কুটারে বসে বসে তিনজনের চোখেই ঘুম নেমে আসে, আধোঘুমে কেউ-না আবার স্কুটার থেকে পড়ে যায় সেই ভয়ে রইসউদ্দিন তিনজনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রাখলেন। স্কুটারের ঝাঁকুনিতে বাচ্চাগুলোর মাথা তার বুকের মাঝে ঘষা খেয়ে যাচ্ছিল আর হঠাৎ করে রইসউদ্দিনের বুকের মাঝে কেমন জানি করতে থাকে। তাঁর মনে হতে থাকে একা একা নিঃসঙ্গভাবে বেঁচে না থেকে তিনিও যদি বিয়ে করে সংসারী হতেন তা হলে এখন হয়তো তার নিজের এরকম কয়জন সন্তান হত, তাদের হাত ধরে তিনি শিশুমেলা নিয়ে যেতেন। কিন্তু এখন তাঁর জন্যে খুব দেরি হয়ে গেছে।

রাত্রিবেলা খাবার পর শিউলি এসে খুব কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "চাচা!"

"কী হল?"

"আমার ছোট চাচা তো অনেক টাকা পাঠিয়েছে, তা-ই না?"

"হ্যাঁ, পাঠিয়েছেন।"

"এই টাকা খরচ করে—ইয়ে—মানে—ইয়ে—"

"কী?'

"খোকনকে আমাদের সাথে রাখতে পারি না?"

রইসউদ্দিন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "খোকনের নিজের বাবা-মা ভাই-বোন—"

শিউলি বাধা দিয়ে বলল, "কেউ নেই। কেউ নেই তার। দূর সম্পর্কের ফুপুর সাথে থাকে। সেই ফুপু একেবারে আদর করে না।"

রইসউদ্দিন চুপ করে রইলেন। শিউলি অনুনয় করে বলল, "খোকনকে দেখে মায়া পড়ে গেছে চাচা। যে-কয়দিন আমি আছি আমাদের সাথে থাকুক। আমি যখন চলে যাব তখন বল্টু আর খোকনও চলে যাবে।" শিউলি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমরা কোনোরকম দুষ্টুমি করব না। খুব ভালো হয়ে থাকব।"

রইসউদ্দিন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে। কিন্তু একটা কথা।"

"কী কথা?'

"এই শেষ। তোমরা আর নতুন কোনো বাচ্চা আমদানি করতে পারবে না। প্রথমে তুমি, তার পরে এসেছে বল্টু। এখন হল খোকন। এইভাবে যদি একজন একজন করে আসতে থাকে তা হলে কয়েকদিন পর এই বাসায় আর আমার থাকার জায়গা থাকবে না।"

"ঠিক আছে চাচা, আর কেউ আসবে না।"

"মনে থাকে যেন!"

"মনে থাকবে।"

সপ্তাহ দুয়েক পর শিউলির ছবি পেয়ে তার ছোট চাচা আবার বিশাল একটা চিঠি লিখলেন রইসউদ্দিনকে। চিঠির শেষে লিখলেন, "...আপনার পাঠানো ছবিতে শিউলির সাথে আপনার ফুটফুটে দুই ছেলেকে দেখে বড় ভালো লাগল। ছবিতে শিউলির মুখে যে-হাসি দেখেছি সেটি দেখে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি মেয়েটিকে আপনি আপনার নিজের মেয়ের মতো করেই দেখেশুনে রাখছেন। শিউলির বড় সৌভাগ্য সে আপনার মতো একজনের ভালোবাসা পেয়েছে। আপনার জন্যে, আপনার স্ত্রীর জন্যে এবং আপনার ফুটফুটে দুই ছেলের জন্যে অসংখ্য ভালোবাসা।..."

পুরো ব্যাপারটি কেমন করে শিউলির ছোট চাচাকে বোঝাবেন রইসউদ্দিন চিন্তা করে পেলেন না। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা নিয়ে চুপচাপ থাকাই তাঁর কাছে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হল। সামানাসামনি যখন দেখা হবে তখন ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেই হবে।

৭

সকালবেলা শিউলি যখন স্কুলে যায় তখন বল্টু আর খোকন তার সাথে বের হয়ে যায়, তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে দুজন শহর ঘুরতে বের হয়। শিউলি আগে স্কুলে গিয়েছে বলে তাকে এখানে স্কুলে দিতে সমস্যা হয়নি। কিন্তু বল্টু আর খোকন পড়ালেখা জানে না, তাদেরকে স্কুলে ঢোকানো ভারি সমস্যা। এখন স্কুলে পড়তে হলে তাদের একেবারে ক্লাস ওয়ানের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সাথে পড়তে হবে, কিন্তু কোনো স্কুলই সেভাবে নিতে রাজি নয়। স্কুলে পড়তে হবে না জেনে বল্টু আর খোকনের দুজনেরই মনে ভারি আনন্দ।

কিছুদিনের মাঝেই অবিশ্যি এই আনন্দে ভাটা পড়ল—মতলুব মিয়া একদিন খবর আনল কাছেই এন.জি.ও.-র লোকজন মিলে একটা স্কুল দিয়েছে, যত ভিখিরির ছেলেমেয়েরা সেখানে নাকি পড়তে যাচ্ছে। মতলুব মিয়া শুনেছে অত্যন্ত কড়া একজন মাস্টারনি এসেছেন। পান থেকে চুন খসলে নাকি রক্তারক্তি কারবার হয়ে যায়—বল্টু আর খোকনকে শায়েস্তা করার এর থেকে ভালো উপায় আর কী হতে পারে?

রইসউদ্দিন খবর পেয়ে বল্টু আর খোকনকে সত্যি সত্যি একদিন এই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে এলেন। বাসার কাজের ছেলেমেয়েরা, টোকাই, মিস্তিরা এই স্কুলে পড়তে আসে বলে এটা শুরু হয় দুপুরবেলা, দুঘণ্টা পরে ছুটি। প্রথম কয়েকদিন বল্টু আর খোকন বেশ উৎসাহ নিয়েই গেল, কিন্তু যখন সত্যি সত্যি অক্ষর-পরিচয় করিয়ে পড়াশোনা শুরু হয়ে গেল তখন তাদের উৎসাহ পুরোপুরি উবে গেল। ঘর থেকে স্কুলে যাবার নাম করে তারা বের হত, কিন্তু কোনোদিন যেত বাজারে, কোনোদিন রেল-স্টেশনে। তারা মনে করেছিল ব্যাপারটা কোনোদিন ধরা পড়বে না, কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা এত সহজ নয়। সন্ধেবেলা শিউলি পড়তে বসেছে এবং বল্টু আর খোকন মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে ষোলোগুটি খেলছে ঠিক তখন দরজায় একটা শব্দ হল। মতলুব মিয়া দরজা খুলে দেখে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের একজন ভদ্রমহিলা। সাধারণ একটা শাড়ি পরে এসেছেন, চোখে চশমা, কাঁধ থেকে বড় একটা ব্যাগ ঝুলছে। মতলুব মিয়াকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এইখানে কি বল্টু আর খোকন থাকে?"

মতলুব মিয়া কানে আঙুল দিয়ে কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "থাকার কথা না, কিন্তু এখন থাকে।"

বল্টু আর খোকনকে পেয়ে মনে হল ভদ্রমহিলা খুব আশ্বস্ত হলেন। ঘরের ভেতরে ঢুকে বললেন, "আমি কি ওদের গার্জিয়ানের সাথে কথা বলতে পারি?"

মতলুব মিয়া ঘাড় বাঁকা করে বলল, "কী করেছে ঐ দুই বদমাইশ আমাকে বলেন। পিটিয়ে সিধে করে ছেড়ে দেব। আমাকে চিনে না। হুঁ!"

ভদ্রমহিলা বললেন, "না, এটা পিটিয়ে সিধে করার ব্যাপার নয়—আর সত্যি কথা বলতে কী, যে-সমস্যা পিটিয়ে সমাধান করতে হয় সেটা সমাধান না করাই ভালো।"

ভদ্রমহিলা কী বলছেন মতলুব মিয়া ঠিক বুঝল না, কিন্তু ভান করল সে পুরোটাই বুঝেছে।

"আমি কি একটু ওদের গার্জিয়ানের সাথে কথা বলতে পারি?"

"জি। আপনি বসেন, আমি ডেকে আনি।"

রইসউদ্দিন খালিগায়ে লুঙ্গি পরে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। একজন ভদ্রমহিলা দেখা করতে এসেছে শুনে লুঙ্গি পালটে প্যান্ট আর একটা ফুলহাতা শার্ট পরে বাইরে এলেন। ভদ্রমহিলা তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বললেন, "আমার নাম শিরিন বানু, এই এলাকায় বাচ্চাদের যে-স্কুলটা খোলা হয়েছে আমি তার শিক্ষিকা। বল্টু আর খোকন আমার স্কুলের ছাত্র, তাদের নিয়ে একটু কথা বলতে এসেছিলাম।"

রইসউদ্দিন মহিলাদের সাথে ঠিক কথা বলতে পারেন না। খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে বললেন, "ও হ্যাঁ। মানে ঠিক আছে—কিন্তু মানে ইয়ে, ও হ্যাঁ। বেশ তা হলে—"

শিরিন বানু বললেন, "আমি কি বসতে পারি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বসেন।"

শিরিন বানু বসলেন। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "বল্টু আর খোকন দুজনই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছেলে। আমার ধারণা তাদের আই কিউ একশো চল্লিশের বেশি হবে। এদের সাথে আপনার সম্পর্কটা ঠিক কীরকম একটু জানতে চাচ্ছিলাম।"

রইসউদ্দিন তখন কীভাবে কীভাবে শিউলি, বল্টু এবং খোকনের পাল্লায় পড়েছেন ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললেন। শুনে শিরিন বানু অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, "আপনি তো সাংঘাতিক মানুষ! আপনি জানেন আজকাল আপনাদের মতো মানুষ খুব বেশি পাওয়া যায় না?"

রইসউদ্দিন ঠিক বুঝতে পারলেন না শিরিন বানু জিনিসটা প্রশংসা করে বলেছেন কি না, তাই অনিশ্চিতের মতো মাথা নেড়ে মুখে খানিকটা হাসি মাখিয়ে বসে রইলেন। শিরিন বানু বললেন, "আমার স্কুলে বল্টু আর খোকন হচ্ছে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছাত্র। কিন্তু তারা গত তিনদিন থেকে স্কুলে আসছে না।"

"সেকী!" রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, "মতলুব মিয়া যে বলল তারা স্কুলে যাচ্ছে!"

"না। যাচ্ছে না।"

"আপনি দাঁড়ান, আমি ডেকে জিজ্ঞেস করি।"

বল্টু আর খোকনকে ডাকা হল এবং ঘরে ঢুকে শিরিন বানুকে দেখে দুজনেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। চেয়ারে রইসউদ্দিন এবং দরজায় মতলুব মিয়া না থাকলে দুজনেই উঠে একটা দৌড় লাগাত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শিরিন বানু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার মিস্টার বল্টু এবং মিস্টার খোকন? আমাকে চিনতে পেরেছ?"

দুজনে ফ্যাকাশে মুখে মাথা নাড়ল। শিরিন বানু বললেন, "আমি খোঁজ নিতে এলাম। স্কুলে আসছ না কেন?"

দুজনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। শিরিন বানু বললেন, "কী হল, কথা বলছ না কেন?"

বল্টু কিছু-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। শিরিন বানু বললেন, "বলে ফেলো, কী বলতে চাও।"

বল্টু শেষ পর্যন্ত খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে বলল, "পড়ে কী হবে?"

শিরিন বানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আমাকে জিজ্ঞেস করো 'পড়ে কী হবে না', দেখি বলতে পারি কি না।"

"পড়ে কী হবে না?"

"পড়ে সাঁতার শেখা যায় না, পানিতে নামতে হয়। পড়ে সাইকেলও চালানো যায় না, সাইকেলে উঠে প্র্যাকটিস করতে হয়। এ ছাড়া মোটামুটি সবকিছু বই পড়ে করা যায়।"

চোখের মাঝে দুষ্টুমি ফুটিয়ে খোকন জিজ্ঞেস করল, "বই পড়ে ওড়া যায়?"

"যায়। হ্যান্ড-গ্লাইডার দিয়ে মানুষজন পাখির মতো আকাশে ওড়ে। বই না পড়লে তুমি হ্যান্ড-গ্লাইডার ডিজাইন করতে পারবে না। যা-ই হোক এখন আসল কারণ বলো, স্কুলে কেন আসছ না?"

বল্টু বলল, "পড়তে ভালো লাগে না।"

খোকন বলল, "কিছু বুঝি না।"

শিরিন বানু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "তা হলে তো কোনো সমস্যাই নেই। কাল থেকে স্কুলে যাবে।"

"কেন আপা?"

"তোমাদের যেন পড়তে ভালো লাগে আর পড়ে যেন সবকিছু বোঝ আমি তার ব্যবস্থা করব।"

"কীভাবে?"

"গেলেই দেখবে।"

"আর যদি না যাই?"

"যদি না যাও তা হলে আমি বই-খাতা নিয়ে বাসায় চলে আসব।"

বল্টু আর খোকন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শিরিন বানুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, আপা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন। এটা তো সত্যিই হতে পারে না যে স্কুলের একজন আপা পড়ানোর জন্যে বসায় চলে আসবেন!

পরের দিনটা বল্টু আর খোকন খুব অশান্তি নিয়ে কাটাল। স্কুলে তারা আঃ যাবে না ঠিক করে ফেলেছে। আর কয়দিন পরেই শিউলির ছোট চাচা এসে শিউলিকে নিয়ে আমেরিকা চলে যাবেন, তখন বল্টু আর খোকন যে যার মতো চলে যাবে। এই অল্প কয়দিন তারা একসাথে আছে, তিনজনই এমন ভান করছে যে তারা যেন আপন ভাইবোন! আসলে তো সেটা সত্যি না, কাজেই ভালো জামাকাপড় পরে বড়লোকদের বাচ্চার মতো স্কুলে গিয়ে আর কী হবে?

সন্ধেবেলা সত্যি সত্যি তো আর স্কুলের আপা চলে আসবেন না, কিন্তু সত্যিই যদি চলে আসেন তার জন্যে বল্টু আর খোকন ব্যবস্থা করে রাখল। আপাকে এমন একটা শিক্ষা দিয়ে দেবে যে আপা আর জন্মেও এইমুখো আসবেন না! কী করা যায় সেটা নিয়ে

অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছে, তাদের মাথা থেকে বেশি বুদ্ধি বের হয়নি, কিন্তু শিউলি অনেকগুলো বুদ্ধি দিয়েছে। এইসব ব্যাপারে শিউলির বুদ্ধি একেবারে এক নম্বুরি! চিনি না দিয়ে লবণ আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে চা, আপার চিরুনিতে চুইংগাম চিবিয়ে লাগিয়ে দেওয়া, মাটির ঢেলা দিয়ে চকলেট তৈরি করা, দরজার উপরে ঠোঙার মাঝে ময়দা ভরে রাখা যেন দরজা খুলতেই মাথার উপরে এসে পড়ে— এইরকম অনেকগুলো বুদ্ধির ধারা করে রাখা হল।

সন্ধের একটু পরে সত্যি সত্যি শিরিন বানু এসে হাজির হলেন। বল্টু আর খোকনকে পড়াতে এসেছেন শুনে মতলুব মিয়া তাঁকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল, চেয়ারে বসিয়ে বলল, "খামোকা চেষ্টা করছেন আপা, বদের হাড্ডি এরা, জীবনেও পড়বে না।"

"চেষ্টা করে দেখি।"

"কোথায় আর চেষ্টা করছেন? বেত কই আপনার? বেত ছাড়া চেষ্টা হয় নাকি?"

শিরিন বানু কিছু বললেন না, কিছুক্ষণের মাঝে বল্টু আর খোকন অপরাধীর মতো মুখ করে এসে হাজির হল। মজা দেখার জন্যে পিছুপিছু এল শিউলি। এই বাসায় যে-জিনিসটা কেউ এখন পর্যন্ত ভালো করে লক্ষ করেনি শিউলির সেটা প্রথমেই চোখে পড়ল। এই মহিলাটি যদি তাঁর চুলকে শক্ত করে পেছনে টেনে না বেঁধে একটু ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ছড়িয়ে দিতেন, চোখের চশমাটা খুলে ফেলতেন, এরকম সাদাসিধে একটা শাড়ি না পরে সবুজ জমিনের উপর হালকা কাজ-করা একটা শাড়ি পরতেন, ঠোঁটে একটু লিপস্টিক লাগিয়ে মুখের কঠিন ভাবটা সরিয়ে মুখে একটু মিষ্টি হাসি দিতেন তা হলে তাঁকে রীতিমত সুন্দরী বলে চালিয়ে দেওয়া যেত।

শিরিন বানু অবশ্য নিজের চেহারা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামান বলে মনে হল না। ব্যাগ থেকে বই-খাতা বের করে বল্টু আর খোকনকে পড়াতে শুরু করে দিলেন। স্বরবর্ণ শেষ করে ব্যঞ্জনবর্ণে যেতে-না-যেতেই বল্টু তাকে থামিয়ে বলল, "আপা!"

"কী হল?"

"আপনি যে পড়াতে এসেছেন সেজন্যে খুব খুশি হয়েছি।"

"তোমরা খুশি হয়েছ শুনে আমিও খুশি হয়েছি।"

"আপনি খুশি হয়েছেন শুনে আমরাও খুশি হয়েছি। আমরা তাই আপনার জন্যে দুইটা চকলেট নিয়ে এসেছি।"

"চকলেট! বাহ্! কী চমৎকার! চকলেট আমার সবচেয়ে ফেবারিট।"

বল্টু তখন কাঁপাহাতে আপার হাতে দুইটা চকলেট তুলে দিল। সারাদিন খেটেখুটে চকলেটটা তৈরি হয়েছে। মাটির ঢেলার সাথে মরিচের গুঁড়া। উপরে খয়েরি রং দেখে চকলেটই মনে হয়। আপা ব্যাগ খুলে ভেতরে চকলেট দুটি রাখলেন। বললেন, "বাসায় গিয়ে খাব।"

আবার পড়াশোনা শুরু হল। বল্টু তখন সাবধানে আপার ব্যাগ খুলে তার চিরুনিটা বের করে সেখানে একটা চিউইংগাম লাগিয়ে দিল। তার হাতের কাজের কোনো তুলনা নেই, আপা কিছু টের পেলেন না। চিউয়িংগামটা আগেই চিবিয়ে নরম করে টেবিলের তলায় লাগিয়ে রাখা ছিল—একেবারে পাকা কাজ, কোনো ভুলত্রুটি নেই। আরও খানিকক্ষণ কেটে গেল, খোকন হঠাৎ মাথা তুলে বলল, "আপা!"

"কী হল?"

"চা খাবেন?"

"না খোকন, চা খাব না। থ্যাংকিউ।"

"চা খাবেন না?" খোকনকে হঠাৎ বিচলিত দেখা গেল, "চা না খেলে কেমন করে হবে? চা খেতেই হবে আপা।"

"খেতেই হবে?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে তা হলে খাব।"

"আমি চা নিয়ে আসি আপা।"

খোকন ঘর থেকে বের হয়ে গেল এবং প্রায় সাথে সাথে এক কাপ চা নিয়ে এল। শিরিন বানু দীর্ঘদিন থেকে দুষ্টু ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করে আসছেন, তাদের দুষ্টুমি ধরে ফেলার তাঁর একটা আলাদা ক্ষমতা রয়েছে। এবারেও হঠাৎ করে খোকনের চায়ের কাপ নিয়ে আসার ভঙ্গিটা দেখে তাঁর মাথায় একটা সন্দেহ উঁকি দিল। চায়ের রং এবং সেখান থেকে বের হওয়া মরিচের সূক্ষ্ম একটা ঘ্রাণ দেখে তাঁর সন্দেহটা পাকা হয়ে গেল, কিন্তু শিরিন বানু তাঁর ভাবভঙ্গিতে সেটা প্রকাশ করলেন না। কাপটা নিজের কাছে টেনে নেবার ভঙ্গি করে এক ফোঁটা চা আঙুলে লাগিয়ে নিলেন এবং পড়ানোর ফাঁকে একসময় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে জিবে লাগিয়ে সেটা চেখে দেখলেন, ভয়ংকর তেতো এবং ঝাল, উৎকট একটা গন্ধও রয়েছে সেখানে। দুষ্টু ছেলেমেয়েগুলো কী করতে চাইছে বুঝতে তাঁর একটুও দেরি হল না। চায়ের কাপটা মুখের কাছে নিয়ে খাবার ভঙ্গি করে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, "শুধু আমি একা খাব সেটা কেমন করে হয়?"

"আমরা খেয়েছি আপা। আপনি খান।"

শিরিন বানু কোনো কথা না বলে পিরিচে খানিকটা চা ঢাললেন, সেটাকে ঠাণ্ডা হওয়ার মতো সময় দিলেন, তারপর খোকনের গাল ধরে আদর করার ভঙ্গি করে বললেন, "আমার সাথে একটু খাও খোকন।"

খোকনের মুখ আতঙ্কে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে মাথা নাড়তে থাকে এবং হঠাৎ করে টের পায় তার গালটি আদর করে ধরে রাখলেও তার এতটুকু নড়ার উপায় নেই। বাচ্চাদের তিতকুটে ওষুধ খাওয়ার সময় মায়েরা যেভাবে ছোট বাচ্চার মুখ ধরে রেখে সেখানে ওষুধ ঢেলে দেয় অনেকটা সেভাবে শিরিন বানু খোকনের মুখে খানিকটা চা ঢেলে দিলেন। খোকনের চোখ গোল গোল হয়ে গেল, ভয়ংকর বিস্বাদ চা এক ঢোক খেয়েও ফেলল, তারপর লাফিয়ে উঠে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাগল। শিরিন বানু মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে বল্টুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "চা খেয়ে অভ্যাস নেই খোকনের, একফোঁটা চা খেয়ে কী করছে দেখেছ?"

বল্টু দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল, কিছু-একটা বলতে চাইছিল কিন্তু তার আগেই আপা তার গালটা ধরে ফেলেছেন। হাসিহাসি মুখে করে বললেন, "তুমি তো চা খাও, তাই না?"

বল্টু মাথা নাড়ানোর চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। আপাকে দেখে বোঝা যায় না কিন্তু তাঁর আঙুলগুলোতে অসম্ভব জোর। মনে হয় জানালার শিক এক আঙুলে বাঁকা করে ফেলবেন। বল্টু কিছু বোঝার আগে আপা তার মুখ ফাঁক করে সেখানে খানিকটা চা ঢেলে দিয়েছেন। মনে হল কেউ বুঝি তার মুখের ভেতরে পেট্রল ঢেলে সেখানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বল্টু সারা ঘরময় ছোটাছুটি করতে থাকে, কী করবে বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জানালার কাছে গিয়ে কুলি করে চাটুকু বের করে দিল।

শিরিন বানু মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন, "কী হল তোমাদের? একটু চা খেয়ে এরকম লাফালাফি করছ কেন?"

বল্টু মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিতে নিতে বলল, "চা—চা'টা ঠিক করে তৈরি হয় নাই।"

"ঠিক করে তৈরি হয় নাই?"

"না। ভু-ভু-ভুল করে ঝাল দিয়ে দিয়েছে।"

"তাই নাকি?" শিরিন বানু খুব অবাক হবার ভান করলেন, "ঝাল চা তো কখনো শুনিনি! দেখি কেমন।"

শিরিন বানু কাপ থেকে সুড়ুৎ করে এক চুমুক চা চুমুক দেবার ভান করে বললেন, "বেশি ঝাল তো নয়, খাওয়া যাচ্ছে। তোমরা খাবে আরেকটু?"

খোকন আর বল্টু জোরে জোরে মাথা নাড়ল, "না আপা, না।"

"কেন না?"

"খু-খু-খুব ঝাল লেগেছে।"

শিরিন বানুর চোখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "মিষ্টি কিছু খেলে মুখের ঝাল কেটে যাবে। আমার কাছে আছে। এসো।"

শিরিন বানু তাঁর ব্যাগ খুলে দুটি চকলেট বের করলেন, একটু আগে বল্টু এবং খোকন তাঁকে চকলেট দুটি দিয়েছে। মোড়ক না খুলেই এখন তিনি বলতে পারেন এগুলো নিরীহ চকলেট নয়। শুধু তাই না, ব্যাগ খুলে তিনি আর একটা জিনিস আবিষ্কার করলেন, তাঁর চিরুনিটার মাঝে কীভাবে জানি খানিকটা চিউয়িংগাম আটকে রয়েছে, মাথার চুলে চিউয়িংগাম লাগিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি তিনি বহুকাল আগে থেকে জানেন। তাঁর সামনে বসে থেকে এই দুইটি বাচ্চা কীভাবে তাঁর ব্যাগ খুলে সেখানে তাঁর চিরুনিতে চিউয়িংগাম লাগিয়ে দিয়েছে তিনি চিন্তা করে পেলেন না, কিন্তু যেভাবেই সেটা করে থাকুক সেটার জন্যে তাদের বাহবা দেওয়া উচিত। শিরিন বানু অবিশ্যি তখন-তখনই কোনো বাহবা দিলেন না, তাঁর মুখে মুগ্ধ হওয়ার কোনো চিহ্নও ফুটে উঠল না।

চকলেট দুটি দেখেই বল্টু এবং খোকনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, শিরিন বানু সেটা দেখেও না-দেখার ভান করলেন, বললেন, "এসো বল্টু, এসো খোকন, চকলেট খেয়ে যাও।"

তারা নিজে থেকে এল না বলে শিরিন বানু মুখে হাসি ফুটিয়ে রেখে তাদের ধরে আনলেন, চকলেটের মোড়ক খুলে তাদের মুখে চকলেট গুঁজে দিলেন। কাজটি খুব সহজে করা গেল না, মৃদু ধস্তাধস্তি করতে হল। চকলেট মুখে নিয়ে তারা মুখ বিকৃত করে কয়েক সেকেন্ড বসে থেকে বাথরুমে ছুটে গেল।

বাথরুম থেকে মুখ ধুয়ে যখন ফিরে এসেছে তখন বল্টু আর খোকন দুজনেই মোটামুটি দুর্বল হয়ে এসেছে। স্কুলের যে-আপাটিকে খুব সহজেই একটা বড় শিক্ষা দিয়ে দেবে বলে ভেবেছিল, সেই কাজটি এখন আর খুব সহজ মনে হচ্ছে না। কাজটি যে প্রায় অসম্ভব হতে পারে সে-ব্যাপারে তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যখন দেখল আপা হাতে তাঁর চিরুনিটা নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাদের দেখে মিষ্টি করে হেসে বললেন, "আমি যখন তোমাদের মতো ছোট ছিলাম তখন চকলেট খেতে কী যে ভালো লাগত! তোমরা দেখি একেবারেই চকলেট খেতে চাও না!"

বল্টু আর খোকন কী বলবে বুঝতে পারল না, খানিকটা হতভম্বের মতো শিরিন বানুর দিকে তাকিয়ে রইল। শিরিন বানু বললেন, "তোমাদের সাথে তো রীতিমতো কুস্তি করতে হল, দেখো তোমাদের চুলের কী অবস্থা! কাছে এসো, চুল ঠিক করে দিই।"

বল্টু আর খোকন কাঁদোকাঁদো হয়ে গেল, ভাঙা গলায় বলল, "লাগবে না আপা, লাগবে না।"

"কেন লাগবে না! কী মিষ্টি তোমাদের চেহারা—চুল আঁচড়ে নিলে আরও কত সুন্দর দেখাবে। এসো, কাছে এসো।"

কাচপোকা যেভাবে তেলাপোকাকে টেনে আনে আপা সেভাবে দুজনকে টেনে এনে চুল আঁচড়ে দিলেন। তাদের মাথায় কোথায় চিউয়িংগামটা লেগেছে সেটা এখন আর পরীক্ষা করার উপায় নেই।

চুল আঁচড়ে মোটামুটি ভদ্র সেজে দুজন আবার পড়তে বসল, যে-জিনিসটা শেখাতে স্কুলের অন্য ছেলেমেয়েদের কয়েক সপ্তাহ লেগে যায় এই দুজন সেটা এক ঘণ্টার মাঝে শিখে ফেলল। এই আশ্চর্যরকম বুদ্ধিমান দুজন বাচ্চার জন্যে শিরিন বানু নিজের ভেতরে এক গভীর মায়া অনুভব করলেন, কিন্তু সেটা আর তাদের সামনে প্রকাশ করলেন না।

বিদায় নেবার সময় উঠে দাঁড়াতেই বল্টু আর খোকনের চোখে হঠাৎ করে এক মুহূর্তের জন্যে একটা উত্তেজনার চিহ্ন দেখে শিরিন বানু বুঝতে পারলেন তাঁকে নাস্তানাবুদ করার ব্যাপারটি এখনও শেষ হয়নি। কী হতে পারে সেটা একটু অনুসন্ধান করতেই দরজার ওপর রাখা ঠোঙাটা তাঁর চোখে পড়ল। সেটা না-দেখার ভান করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং দরজার কাছে গিয়ে হঠাৎ কিছু-একটা মনে পড়েছে এরকম ভঙ্গি করে দুজনকে ডাকলেন, বল্টু আর খোকন খুব সহজেই তাঁর ফাঁদে পা দিল। বল্টু আর খোকনকে স্কুলসংক্রান্ত কিছু-একটা উপদেশ দিয়ে দুজনকে দুই হাতে ধরে রেখে নিজের সামনে রেখে শিরিন বানু দরজায় হাত দিলেন।

সাথে সাথে দরজার উপরে খুব সাবধানে বসিয়ে-রাখা ঠোঙাটা উলটে নিচে পড়ল, এর ভেতরে ময়দা বা আটা যেটাই রাখা ছিল সেটা উপুড় হয়ে পড়ল দুজনের মাথায়। এমনিতে দুর্ঘটনাটা ঘটলে এত নিখুঁতভাবে তাদের মাথায় পড়ত কি না সন্দেহ ছিল, কিন্তু শিরিন বানু চোখের কোনা দিয়ে ঠোঙাটাকে লক্ষ করে দুজনকে ঠেলে ঠিক সময় ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। মাথায় উপর সারাসরি এক ঠোঙা ময়দা পড়ার পর দুজনের যা একটা চেহারা হল সে আর বলার মতো নয়! শিউলি তাদের দেখে পেটে হাত দিয়ে যেভাবে হিহি করে হাসতে শুরু করল যে তার শব্দে বসার ঘর থেকে রইসউদ্দিন এবং রান্নাঘর থেকে মতলুব মিয়া এসে হাজির হল।

যে-ময়দা দিয়ে সকালে পরোটা তৈরি হয় নাশতা করার জন্যে, বল্টু আর খোকন কেন সেটা মাথায় দিয়ে বসে আছে সেটা ব্যাখ্যা করা খুব সহজ হল না। শিরিন বানু খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে দেখলেন কিন্তু সেটা তাঁর জন্যে হজম করা খুব কঠিন হয়ে পড়ল। হাসি চেপে কোনোরকমে চলে যাবার আগে শুধু তাদের মনে করিয়ে দিলেন বল্টু আর খোকন যদি পরদিন স্কুলে না যায় শিরিন বানু পরদিন আবার চলে আসবেন।

বল্টু আর খোকনের মাথায় যেখানে চিউয়িংগাম লেগে গেছে সেটা দূর করা খুব সহজ হল না। এরকম সময় যা করতে হয় এবারেও তাই করা হল—খানিকটা চুল কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হল। সামনে থেকে সেটা দেখা যাচ্ছিল না বলে বল্টু আর খোকন বেশি বিচলিত হল না, কিন্তু পিছন থেকে দেখে হাসতে হাসতে শিউলির চোখে পানি এসে গেল। সে চোখ মুছে বলল, "এই বল্টু আর খোকন, এই আপা তোদের একেবারে ছাগল বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।"

বল্টু চোখ পাকিয়ে শিউলির দিকে তাকাল। শিউলি হাসি থামিয়ে বলল, "খামোকা আপার সাথে লাগতে যাবি না। কাল থেকে সময়মতো স্কুলে যাবি।"

বল্টু আর খোকন কিছু বলল না, কিন্তু তারা টের পেয়ে গেছে স্কুলে তাদের যেতেই হবে। যে-স্কুলে হাজির না হলে স্কুলটাই বাসায় হাজির হয়ে যায় তার থেকে রক্ষা পাবার উপায় কী?

৮

বিকালবেলা শিউলি, বল্টু আর খোকন হাঁটতে বের হয়েছে। বল্টু আর খোকন আজকাল পড়তে শিখে গেছে, দোকানের সাইনবোর্ড দেখলেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটা পড়ার চেষ্টা করে। বড় একটা গয়নার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বল্টু সাইনবোর্ডটা পড়ে শেষ করল, "হীরামন জুয়েলার্স ডড নং কামারপাড়া রোড।" বল্টু একটু অবাক হয়ে শিউলির দিকে তাকিয়ে বলল, "শিউলি আপু, ডড নং মানে কী?"

শিউলি হিহি করে হেসে বলল, "দূর গাধা, ডড নং না, এটা হচ্ছে ৬৬ নং।"

বল্টু একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "তাই বলো! আমি আরও ভাবছি ডড নং কী!"

খোকন গয়নার দোকানের পাশে একটা মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ড পড়তে শুরু করেছে, হঠাৎ শিউলি চমকে উঠে বল্টুর পিছনে লুকিয়ে গেল। বল্টু অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে শিউলি আপু?"

শিউলি ফিসফিস করে বলল, "চুপ কর গাধা, কথা বলবি না।"

"কেন?"

"ঐ যে দূরে দুইজন লোক, একজন ছাগলদাড়ি আর নীল পাঞ্জাবি ঐ লোকগুলোকে আমি চিনি। বুড়াটার নাম মোল্লা কফিলউদ্দিন।"

"একজনের কোলে যে একটা বাচ্চা, সেই লোকটা?"

"হ্যাঁ। আর তার পাশে যে লোকটা তার নাম ফোরকান আলি। মহা বদমাইশ লোক। কিডনি-ব্যাপারী।"

"কিডনি-ব্যাপারী? সেটা আবার কী?"

শিউলি অধৈর্য হয়ে বলল, "তুই বুঝবি না। চুপ করে দেখ কোনদিকে যায়।"

বল্টু আর খোকনের পিছনে শিউলি নিজেকে আড়াল করে রাখল, তারা দেখল ছোট একটা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে মোল্লা কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলি রাস্তা পার হয়ে অন্য পাশে চলে গেল। দূর থেকে শিউলি বল্টু আর খোকনকে নিয়ে তাদের লক্ষ করতে থাকে। ফোরকান আলি কফিলউদ্দিনকে কিছু-একটা বলল, তারপর দুজন মিলে হনহন করে হাঁটতে থাকে। শিউলি ফিসফিস করে বল্টু আর খোকনকে বলল, "চল পিছুপিছু, দেখি কোথায় যায়।"

বড় রাস্তা পার হয়ে তারা একটা ছোট রাস্তা পার হল, সেখান থেকে আবার একটা রাস্তা, সেখানে বড় একটা দালানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। শিউলি দেখল দালানটির মাঝামাঝি এক জায়গায় একটা বড় সাইনবোর্ড, সেখানে লেখা 'বিউটি নার্সি হোম'।

কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলি বেশ দূরে, শিউলির কথা শোনার কোনো আশঙ্কা নেই, তবুও শিউলি গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, "এইখানে নিশ্চয়ই কিডনি বিক্রি হয়।"

বল্টু আবার জিজ্ঞেস করল, "কিডনি জিনিসটা কী?"

"তুই বুঝবি না গাধা।"

"এখন কী করবে?"

'দেখি কী করা যায়।"

কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলি দুজনে নিজেদের মধ্যে কিছু-একটা বলাবলি করে ভেতরে ঢুকে গেল। শিউলি খুব চিন্তিতমুখে বলল, "বিপদ হয়ে গেল!"

"কী বিপদ?"

"কফিল চাচা আর ঐ মানুষটা মনে হয় বাচ্চাটাকে এনেছে তার কিডনি কেটে ফেলার জন্যে।"

"কিন্তু কিডনিটা কী জিনিস?

"তুই বুঝবি না গাধা।"

বল্টু বিরক্ত হয়ে বলল, "বলেই দেখো না বুঝি কি না।"

"শরীরের ভেতরে থাকে। কলিজার মতন। অনেক দামে বিক্রি হয়।"

খোকন মুখ বিকৃত করে বলল, "যাহ্!"

"খোদার কসম। রইস চাচা আমাকে না বাঁচালে কফিল চাচা এতদিনে আমার কিডনি বিক্রি করে ফেলত।"

"সত্যি?"

"সত্যি।" শিউলি তখন দুএক কথায় তার কিডনি বিক্রি করার ঘটনাটা বলার চেষ্টা করল।

বল্টু ঠোঁট কামড়ে বলল, "তুমি বলছ এই বাচ্চাটার কিডনি এখন কেটে ফেলবে?"

"মনে হয়।"

"সর্বনাশ! তা হলে তো কিছু-একটা করতে হবে।"

"চল আগে আমরাও ভেতরে ঢুকি।"

"চলো।"

তিনজনে খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে তিনতলায় বিউটি নার্সিং হোমে হাজির হল। কাচের দরজা দিয়ে দেখা গেল ভেতরে একটা ওয়েটিংরুমের মতো, সেখানে একটা সোফায় কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলি বসে আছে। কফিলউদ্দিনের কোলে ছোট বাচ্চাটা। তার হাতে একটা লজেন্স ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে খুব মনোযোগ দিয়ে সেটা চাটছে।

শিউলি গলা নামিয়ে বল্টুকে বলল, "তুই একটা কাজ করতে পারবি?"

"কী কাজ?"

"এই দুইজনের পকেট মেরে যা যা কাগজপত্র আছে সবকিছু নিয়ে আসতে পারবি?"

"না।"

"না কেন?"

"পীরের তাবিজ না হলে আমি পারব না। শরীরবন্ধন ছাড়া যাওয়া ঠিক না।"

"ধুর গাধা, তাবিজ ছাড়াও শরীরবন্ধন হয়।"

'মঙ্গেল বসে আছে, এইরকম কেস কঠিন—মনোযোগ অন্য জায়গায় না থাকলে করা ঠিক না।"

খোকন দুজনের কথা শুনছিল, বলল, "যদি মনোযোগ অন্য জায়গায় দেওয়া যায়?"

"কীভাবে দিবি?"

"মনে করো আমি আর বল্টু ভাই ভেতরে গেলাম, দুজন বসে নিজেদের ভেতরে কথা বলছি তখন হঠাৎ যদি ছোট বাচ্চাটা কথা বলে ওঠে?"

শিউলি মাথা নাড়ল, "এত ছোট বাচ্চা কথা বলবে কেন?"

"আসলে তো আমি বলব। মুরগিকে দিয়ে কথা বলিয়ে দিয়েছি, এইটা তো সোজা—"

শিউলির চোখ হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল, হাতে কিল দিয়ে বলল, "ফাস্ট ক্লাস আইডিয়া! বাচ্চাটা কথা বললেই কফিল চাচা আর ফোরকান আলি একেবারে সাংঘাতিক অবাক হয়ে যাবে, পুরো মনোযোগ থাকবে বাচ্চার দিকে।"

বল্টু খুব চিন্তিতমুখে বলল, "দেখি চেষ্টা করে। আল্লাহ্ মেহেরবান।"

বল্টু কোনো-একটা দোয়া পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে ভেতরে ঢুকল, পেছনে পেছনে খোকন। তাদের দুজনকে দেখে কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলি সরুচোখে তাদের দিকে তাকাল। কোনো একটা-কিছু নিয়ে কথা বলা দরকার তাই বল্টু বলল, "আমাদেরকে এইখানে আসতে বলেছেন না?"

খোকন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। এইখানে।"

"কয়টার সময় জানি আসবে?

"পাঁচটার সময়।"

"তা হলে এখনও যে আসছে না?"

"মনে হয় জামে পড়েছে।"

"ও।"

কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলি এই দুইজনের কথাবার্তা শুনে একটু সহজ হল, কেউ-একজন ছেলে দুজনকে এখানে এসে অপেক্ষা করতে বলেছে, এই নার্সিং হোমে সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

ফোরকান আলির পাশে বসল বল্টু, তার পাশে খোকন। সেখানে বসেও তারা নিজেদের মাঝে কথা বলতে শুরু করে, তখন কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলিও নিচুগলায় কথা বলতে থাকে। হঠাৎ একটা বিচিত্র জিনিস ঘটল, ছোট তিন-চার মাসের বাচ্চাটা হাত নেড়ে বলল, "এই শালা কফিলউদ্দিন!"

কফিলউদ্দিন একেবারে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন । কাঁপাগলায় বললেন, "এই বাচ্চা দেখি কথা বলে!"

ছোট বাচ্চাটা হাতের লজেন্সটা একবার চেটে বলল, "কথা বলব না কেন? একশোবার বলব।"

কফিলউদ্দিন হঠাৎ ভয় পেয়ে বাচ্চাটাকে ফোরকান আলির কোলে বসিয়ে দিল। বাচ্চাটা ফোরকান আলির দিকে তাকিয়ে বলল, "ই ফোরকাইন্যা!"

"এ্যাঁ!" ফোরকান আলি ভয় পেয়ে বলল, "কী বলে এই ছেলে?"

বাচ্চাটা স্পষ্ট গলায় বলল, "এক চড়ে দাঁত ফেলে দেব।"

ফোরকান আলি যেন কোলে একটা বিষাক্ত সাপ নিয়ে বসে আছে এরকম ভান করে বাচ্চাটাকে প্রায় ঠেলে নিচে বসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোট বাচ্চাটা এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "শালা কফিলউদ্দিন আর ব্যাটা ফোরকাইন্যা, তোরা ভেবেছিস আমি কিছু বুঝি না?"

"তু-তু-তুমি কী বলছ?"

"আমি ঠিকই বলছি। পুলিশ আসুক তখন বুঝবে ঠ্যালা!"

কফিলউদ্দিন প্রায় ফ্যাকাশে-মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি এর মাঝে নাই, গেলাম আমি, গেলাম।" তারপর ফোরকান আলিকে কিছু বলতে না দিয়ে প্রায় ঝড়ের মতো ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান কফিল ভাই—" বলে পেছনে পেছনে ছুটে গেল ফোরকান আলি এবং দেখা গেল দুজনে সিঁড়ি বেয়ে দুদ্দাড় করে নেমে যাচ্ছে। বল্টু আর খোকন কী করবে বুঝতে পারল না, এরকম কিছু-একটা যে হতে পারে সেটা তারা একবারও চিন্তা করেনি। বাচ্চাটিকে রেখে যাবে, না সাথে নিয়ে যাবে চিন্তা করে না পেয়ে বল্টু বাচ্চাটাকে ধরে ঘর থেকে বের হয়ে এল। সিঁড়ির কাছে শিউলি দাঁড়িয়ে ছিল, সে কাছে এসে অবাক হয়ে বলল, "কী হল? দুইজন এইভাবে দৌড়ে কোথায় পালিয়ে গেল?"

খোকন খিকখিক করে হেসে বলল, "ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে।"

"কী দেখে ভয় পেয়েছে?"

বল্টু কোনোমতে পেটের সাথে ধরে রাখা নাদুসনদুস বাচ্চাকে দেখিয়ে বলল, "এই বাচ্চাকে দেখে! কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলিকে এমন ধোলাই দিয়েছে যে দুইজন ভয়ে একেবারে চিমশি মেরে গেছে!"

"ধোলাই?"

খোকন আবার খিকখিক করে হেসে বলল, "আমি এর মুখ দিয়ে কথা বলিয়েছি।"

"কিন্তু এখন এই বাচ্চাকে নিয়ে আমরা কী করব?"

"আমি জানি না" বলে খোকন শিউলির কাছে বাচ্চাটাকে ধরিয়ে দিল।

বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে শিউলি বলল, "ইশ, কী গাবদা-গোবদা বাচ্চাটা! দেখে কী মায়া লাগে!"

বল্টু ভুরু কুঁচকে বলল, "কী বলছ! মায়া লাগে? যদি পিশাব করে দেয়?"

"বাজে কথা বলবি না। তোর ধারণা, ছোট বাচ্চা হলেই সে পেশাব করে দেয়?"

শিউলির কথা শেষ হবার আগেই ঝিরঝির করে একটা শব্দ হল এবং মনে হল শিউলিকে সবার সামনে অপদস্থ করার জন্যেই বাচ্চাটি তাকে ভিজিয়ে দিয়েছে।

খোকন হিহি করে হেসে বলল, "ছোট বাচ্চাদের পুরা সিস্টেম উলটাপালটা।"

শিউলি চোখ পাকিয়ে খোকনের দিকে তাকাল, তারপর বাচ্চাটিকে হাত বদলে সাবধানে ধরে রেখে বলল, "এখন একে কী করব?"

বল্টু আবার বলল, "আমি জানি না। আমাকে পকেট খালি করে আনতে বলেছ খালি করে এনেছি। ব্যাটার পকেটে কোনো টাকা-পয়সা নাই, খালি কাগজপত্র। বাচ্চাফাচ্চা কী করবে আমি জানি না।"

খোকন বলল, "এই বাচ্চাটাকে বাসায় নিয়ে যাই। রইস চাচা যদি আমাদের তিনজনকে রাখতে পারে তা হলে আর একজন বেশি হলে ক্ষতি কী?"

বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "একটা ছোট বাচ্চা দশজন বড় মানুষের সমান।"

"কেন?"

"একজন বড় মানুষ কি কখনো ঘরের মাঝখানে পিশাব করবে? করবে না— কিন্তু এই বাচ্চা করে দেবে। একজন বড় মানুষ কি সারারাত গলা ফাটিয়ে চিল্লাবে? চিল্লাবে না—কিন্তু এই বাচ্চা চিল্লাবে। কোনো মানুষকে পছন্দ না হলে একজন বড় মানুষ আরেকজন বড় মানুষের মুখে থামচি মারবে? মারবে না— কিন্তু এই বাচ্চা মারবে।"

"হয়েছে হয়েছে, অনেক হয়েছে।" শিউলি মুখ-ভেংচে বলল, "এখন বোলচাল থামা।"

খোকন আবার বলল, "নিয়ে যাই-না এইটাকে বাসায়। দেখো, কী সুন্দর! একেবারে পুতুলের মতন!"

শিউলি মাথা নাড়ল, "উঁহুঁ। নেয়া যাবে না।"

"কেন নেয়া যাবে না?'

"রইস চাচা বলেছে, আর নতুন কোনো বাচ্চা আমদানি করা যাবে না।"

ছোট বাচ্চাটাকে বগলে চেপে ধরে শিউলি হাঁটতে থাকে। বগলে চেপে ধরে রাখার এই ভঙ্গিটা মনে হল বাচ্চাটারও খুব পছন্দ হল, সে হঠাৎ তার ফোকলা দাঁত বের করে খিক করে হেসে দিল। সেই হাসিটা এতই মধুর যে দেখে বল্টু পর্যন্ত নরম হয়ে পড়ল, বলল, "শিউলি আপু, চলো এইটাকে বাসায় নিয়ে যাই। একটা ছোট বাচ্চা আর কতটুকু জায়গা নেবে?"

খোকন বলল, "আর কতই-বা খাবে!"

বল্টু বলল, "আমরা নাহয় লুকিয়ে রাখব, রইস চাচা টেরই পাবে না।"

"যখন চ্যাঁচাবে?"

"তখন বলব খোকন তার ভেন্টি-কুন্টি না কী যেন সেইটা প্র্যাকটিস করছে।"

শিউলি বলল, "একটা ইঁদুরের বাচ্চা, না হলে চড়ুই পাখির বাচ্চা লুকিয়ে রাখা যায়— তাই বলে আস্ত একটা মানুষের বাচ্চা?"

"কিন্তু তুমি করবেটা কী? এই বাচ্চাটাকে রাস্তায় ফেলে দেবে? তার চেয়ে চলো একবার বাসায় রাখার চেষ্টা করে দেখি।"

শিউলি একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ঠিক আছে, চল দেখি।" বাচ্চাটাকে লুকিয়ে রাখার বুদ্ধিটা যে তার খুব পছন্দ হল তা নয়, কিন্তু তার আর কিছু করার ছিল না।

তিনজন যখন বাচ্চাটাকে নিয়ে বাসায় পৌঁছাল তখনও রইসউদ্দিন বাসায় পৌঁছাননি। বল্টু মতলুব মিয়াকে রান্নাঘরে ব্যস্ত রাখল, সেই ফাঁকে শিউলি আর খোকন লুকিয়ে বাচ্চাটাকে তাদের নিজেদের ঘরে নিয়ে গেল। বাচ্চাদের ঘুমানোর এবং জেগে থাকার বিচিত্র সময় রয়েছে, বিকেলবেলা যখন ছুটোছুটি হৈচৈ করার সময় তখন বাচ্চাটি ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেল। বাচ্চাটাকে কোথায় লুকানো যায় বুঝতে না পেরে শিউলি আর খোকন তাকে বিছানার নিচে ছোট একটা বিছানা তৈরি করে সেখানে ঘুম পাড়িয়ে রাখল। ঘুম থেকে উঠে বাচ্চাটা নিশ্চয়ই খেতে চাইবে, তখন তাকে কী খাওয়াবে এবং কেমন করে খাওয়াবে সেটা নিয়ে শিউলি খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ছোট বাচ্চারা কী খায় সেটা তারা ভালো করে জানে পর্যন্ত না। বল্টু আর খোকন মিলে এক গ্লাস দুধ আর খানিকটা ভাত চুরি করে সরিয়ে রাখল, বাচ্চাটা যখন খেতে চাইবে তখন তাই তাকে খাওয়ানো যাবে।

সেদিন গভীর রাতে রইসউদ্দিন হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, শুনলেন শিউলি বল্টু আর খোকনের ঘর থেকে ছোট বাচ্চার কান্নার আওয়াজ আসছে, একা একা থেকে তিনজন বাচ্চার কোনো-একজন মন-খারাপ করে কান্নাকাটি করলে তিনি এমন কিছু অবাক হতেন না। কিন্তু এটি একেবারে ছোট শিশুর কান্না। রইসউদ্দিন হন্তদন্ত হয়ে বিছানা থেকে নেমে বাচ্চাদের ঘরে এলেন, অবাক হয়ে দেখলেন এত রাতেও তিনজনই জেগে আছে। জিজ্ঞেস করলেন, "ছোট বাচ্চা কাঁদছে কোথা থেকে?"

শিউলি বলল, "খোকন।"

"খোকন?"

"হ্যাঁ।"

শিউলি বলল, "খোকন ভেন্টি-কুন্টি না কী যেন সেইটা প্র্যাকটিস করছে।"

"ভেন্ট্রিলোকুইজম?'

"হ্যাঁ হ্যাঁ।" শিউলি, খোকন আর বল্টু একসাথে জোরে জোরে মাথা নাড়তে শুরু করল।

'এত রাতে ভেন্ট্রিলোকুইজম?"

খোকন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, "দিনের বেলা সময় পাই না তো—তাই রাতের বেলা প্র্যাকটিস করি।"

রইসউদ্দিন একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন কেন এত রাতে ছোট বাচ্চার কান্না ভেন্ট্রিলোকুইজম দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলেন না। বাচ্চাকাচ্চা সম্পর্কে তিনি আগেও বেশি জানতেন না, গত কয়েকমাস থেকে এই তিনজনকে একসাথে দেখে যেটুকু জানতেন সেটা নিয়েও নিজের ভিতরে সন্দেহ হতে শুরু করেছে।

রইসউদ্দিন বিছানায় শোওয়ার জন্যে ফিরে গেলেন এবং সারারাত একটু পরেপরে খোকনের ছোট বাচ্চার কান্নার শব্দের ভেন্ট্রিলোকুইজম শুনে চমকে চমকে জেগে উঠতে লাগলেন।

ভোরবেলা রইসউদ্দিন অফিসে চলে যাবার পর শিউলি মতলুব মিয়াকে রান্নাঘরে ব্যস্ত রাখল তখন খোকন আর বল্টু মিলে ছোট বাচ্চাটিকে নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে গেল। আগে থেকে ঠিক করে রাখা হয়েছে শিউলি যতক্ষণ স্কুলে থাকবে ততক্ষণ বল্টু আর খোকন মিলে বাচ্চাটিকে দেখেশুনে রাখবে। বাসার ভেতরে থাকলে চ্যাচামেচি কান্নাকাটি করতে পারে বলে এই ব্যবস্থা।

স্কুলে যতক্ষণ থাকল আজ শিউলি খুব আনমনা হয়ে থাকল, বাচ্চাটির জন্যে মনটা খুব নরম হয়ে আছে। এইটুকুন একটা বাচ্চা, সারা পৃথিবীতে তাকে দেখে রাখার কোনো মানুষ নেই, তাদের মতো তিনজনকে তাকে দেখে রাখতে হচ্ছে ব্যাপারটা চিন্তা করেই তার কেন জানি মন-খারাপ হয়ে যাচ্ছে । কতদিন বাচ্চাটিকে লুকিয়ে রাখতে পারবে কে জানে—একটা ছোট মারবেলকে লুকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু একটা মানুষকে কি লুকিয়ে রাখা যায়?

স্কুলছুটির পর শিউলি বাইরে বের হয়ে এসে দেখে বল্টু আর খোকন ছোট বাচ্চাটিকে নিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। বাচ্চাটিকে খোকন তার ঘাড়ে বসিয়ে নিয়েছে এবং সে মহাআনন্দে তার মাথার চুল দুই হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। শিউলি জিজ্ঞেস করল, "কোনো সমস্যা হয় নাই তো?'

বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "হয় নাই আবার!"

শিউলি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

বল্টু শিউরে উঠে বলল, "আমি ঘাড়ে করে বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছি হঠাৎ মনে হল গরম কী যেন ঘাড়ের মাঝে থেকে শরীরের মাঝে কিলবিল করে ঢুকে যাচ্ছে। আমি ভাবলাম কী না কী — হঠাৎ দেখি বাচ্চার পিশাব! সর্বনাশ!"

শিউলি খিকখিক করে হেসে বলল, "এইটা আবার এমন কী ব্যাপার! ছোট বাচ্চা মানুষ করতে হলে এটা সহ্য করতে হবে।"

খোকন বলল, "শিউলি আপু, আমি এর নাম দিয়েছি গাণ্ড।"

"গাণ্ড?"

"হ্যাঁ। যখন তার মনে আনন্দ হয় সে বলে গা-গা-গা— আর যখনই রেগে যায় তখন বলে ণ্ড ণ্ড ণ্ড তাই নাম হচ্ছে গাণ্ড। ভালো হয়েছে না নামটা?

বল্টু বিরসমুখে বলল, "কচু হয়েছে। গাণ্ড একটা নাম হল? একটা ছেলের নাম কখনো গাণ্ড হয়?"

শিউলি অবাক হয়ে বলল, "ছেলে? ছেলে কোথায় পেলি? জানিস না এটা মেয়ে?"

"মেয়ে নাকি?" বল্টু মনে হল ভয় পেয়ে দুই পা সরে গিয়ে বলল, "সর্বনাশ!"

শিউলি চোখ পাকিয়ে বলল, "সর্বনাশ? তুই মেয়ের মাঝে সর্বনাশের কী দেখলি?"

বল্টু পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, "মেয়ে মানেই সর্বনাশ! আর সেই মেয়ে যদি ছোট হয় তা হলে সাড়ে সর্বনাশ!"

শিউলি বাচ্চাটিকে নিজের কোলে নিয়ে বলল, 'এত লক্ষী একটা মেয়েকে তুই সাড়ে সর্বনাশ বলিস, এমন দাবড়ানি দেব যে নিজের নাম ভুলে যাবি!"

শিউলির পক্ষে সেটা সত্যিই সম্ভব তাই বল্টু আর কোনো কথা বলল না। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে তিনজনে হাঁটতে থাকে, খোকন হাঁটতে হাঁটতে বলল, "গাণ্ডকে সব উলটাপালটা জিনিস শিখাচ্ছি।"

"উলটাপালটা?"

"হ্যাঁ। হাতকে দেখিয়ে বলেছি পা, পা-কে দেখিয়ে বলেছি হাত। নাককে দেখিয়ে বলেছি পেট, পেটকে দেখিয়ে বলেছি চোখ। গাণ্ড যখন বড় হবে সবকিছু উলটাপালটা বলবে, মজা হবে না?"

শিউলি একটু অবাক হয়ে বলল, "মজা? কোন জায়গাটায় মজা?"

"যেমন মনে করো যখন রেগে উঠবে তখন খিলখিল করে হাসবে, আর যখন খুব হাসি পাবে তখন ভেউভেউ করে কাঁদবে! সবকিছু উলটাপালটা শিখিয়ে দেব।"

শিউলি মাথা নেড়ে বলল "খোকন তুই যখন বড় হবি তখন খবরদার বিয়ে করবি না। আর যদি বিয়ে করিস খবরদার যেন বাচ্চাকাচ্চা না হয়। হলে অনেক বিপদ আছে।"

বল্টু পিচিক করে আবার থুতু ফেলে বলল, "বিপদ হবে আমাদের।"

"কী বিপদ?"

"গাণ্ডর জন্যে আজকে স্কুলে যেতে পারলাম না, সন্ধেবেলা দারোগা আপা না আবার বাসায় এসে যায়!"

সন্ধেবেলা সত্যি সত্যি 'দারোগা আপা' এসে হাজির হয়ে গেলেন। তখন শিউলি, বল্টু আর খোকন মাত্র গাণ্ডকে খানিকটা দুধ খাইয়ে বিছানার নিচে শুইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

আপাকে দেখে বল্টু এবং খোকন ফ্যাকাশে হয়ে গেল, শিউলি কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে খুব খুশি হয়ে যাওয়ার ভান করে বলল, "আসেন আপা আসেন। আসেন আসেন। ভালো আছেন আপা? স্কুলটা ভালো আছে আপা? স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা সব ভালো আছে?"

আপা মাথা নেড়ে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। আমার স্কুলটাও ভালো আছে। ছাত্র-ছাত্রী সবাই ভালো আছে কি না জানি না, তাই খোঁজ নিতে এসেছি।"

আপা বল্টু এবং খোকনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার? স্কুলে আসনি কেন আজ?"

"ইয়ে আপা আমরা খুব একটা ঝামেলায় পড়ে গেলাম—ইয়ে মানে সাংঘাতিক ঝামেলা—"

ঠিক এরকম সময় রইসউদ্দিন তাদের ঘরে এসে হাজির হলেন, মতলুব মিয়া তাঁকে খবর দিয়েছে যে বল্টু আর খোকন নিশ্চয়ই কিছু-একটা গোলমাল করেছে, স্কুলের মাস্টারনি আবার বাসায় চলে এসেছেন। রইসউদ্দিনকে দেখে শিরিন বানু মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "এই যে রইস সাহেব, কেমন আছেন?"

"ভালো। মানে ইয়ে—কোনো সমস্যা?"

"না না, কোনো সমস্যা নেই। আমার সবচেয়ে ব্রাইট দুজন ছাত্র স্কুলে যায়নি তাই খোঁজ নিতে এসেছিলাম।"

"স্কুলে যায়নি?" রইসউদ্দিন আবাক হয়ে বল্টু আর খোকনের দিকে তাকালেন। ঠিক এরকম সময় বিছানার নিচে থেকে গাণ্ডর আনন্দধ্বনি শোনা গেল,"গা গা গা গা—"

শিরিন বানু চমকে উঠলেন, "ওটা কিসের শব্দ?"

শিউলি ঢোক গিলে বলল, "খোকন ভেন্টিকুল্টি—"

রইসউদ্দিন শিউলিকে শুদ্ধ করিয়ে দিয়ে বললেন, "ভেন্ট্রিলোকুইজম। আমাদের খোকন একজন এক্সপার্ট ভেন্ট্রিলোকুয়িস্ট, যে-কোনো জায়গায় শব্দ বের করতে পারে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

সত্যি সত্যি বিছানার নিচে আবার স্পষ্ট শোনা গেল, "গা-গা-গা-গা"। বিছানার নিচে গাণ্ড কী দেখে এত আনন্দ পেয়েছে কে জানে? যতক্ষণ আনন্দে থাকবে সমস্যা নেই, রেগে গেলেই বিপদ।

শিরিন বানু খোকনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "করো দেখি আবার।"

"কী করব?"

"কোনো-একটা শব্দ করো।"

আবার বিছানার নিচে থেকে শব্দ বের হয়ে এল। এবারে "গু-গু-গু"। শিউলি একটু ঘাবড়ে গেল, মনে হচ্ছে গাণ্ড বিছানার নিচে রেগে যাচ্ছে।

শিরিন বানু মুগ্ধ হয়ে খোকনের দিকে তাকালেন, এইটুকু ছেলে কী চমৎকার ভেন্ট্রিলোকুইজম করছে, স্পষ্ট মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে বিছানার নিচে থেকে। রইসউদ্দিন না বললে তিনি নিশ্চয়ই বিছানার নিচে উঁকি দিয়ে দেখতেন।

বিছানার নিচে থেকে আবার "গু-গু-গু-গু" শব্দ বের হয়ে এল। শিরিন বানু স্পষ্ট দেখলেন শিউলি, বল্টু এবং খোকন তিনজনের মুখে কেমন জানি ভয়ের একটা ছাপ পড়েছে। তাঁর কিছু-একটা সন্দেহ হল, তিনি মাথা ঘুরিয়ে আবার বিছানার নিচে তাকালেন এবং হঠাৎ করে চমকে উঠলেন— একটা ছোট শিশুর হাত দেখা যাচ্ছে। বিছানার নিচে থেকে একটা ন্যাদান্যাদা বাচ্চা গড়িয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছে।

শিরিন বানু রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "রইস সাহেব, খোকন খুব বড় ভেন্ট্রিলোকুয়িস্ট! শুধু বাচ্চার গলার শব্দ নয়— সে একটা আস্ত বাচ্চা তৈরি করে ফেলেছে!"

রইসউদ্দিন হতচকিত হয়ে বললেন, "কী বলছেন আপনি!"

"এই দেখেন" বলে শিরিন বানু বিছানার নিচে থেকে গাবদাগোবদা একটা বাচ্চাকে বের করে আনলেন, বাচ্চাটি তখনও হাত নেড়ে নেড়ে কোনো-একটা জিনিস নিয়ে প্রতিবাদ করে বলছে, গু-গু-গু!"

রইসউদ্দিনের কয়েক সেকেন্ড লাগল ব্যাপারটা বুঝতে—যখন বুঝতে পারলেন তখন কেমন যেন আতঙ্কিত হয়ে শিউলি, বল্টু আর খোকনের দিকে তাকালেন। কাঁপা গলায় বললেন, "কী? এটা কী? কী হচ্ছে এখানে?"

শিউলি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রইসউদ্দিন তখন হঠাৎ একটা খুব সাহসের কাজ করে ফেললেন, শিউলিকে ধমক দিয়ে বললেন, "কী হচ্ছে এখানে শিউলি?"

শিউলি একেবারে কাঁদোকাঁদো হয়ে গেল, কাঁচুমাচু-মুখে বলল, "আমি গাণ্ডকে আনতে চাইনি রইস চাচা। কিন্তু কফিল চাচা কিডনি কাটার জন্যে এনেছিল, ভয় পেয়ে রেখে দিয়ে পালিয়ে গেল।"

রইসউদ্দিন চমকে উঠে বললেন, "কী? কী বললে?"

শিউলি পুরো ঘটনাটা খুলে বলল, রইসউদ্দিন প্রথমে হতভম্ব এবং তারপর আস্তে আস্তে হঠাৎ রেগে আগুন হয়ে গেলেন। দাঁত-কিড়মিড় করে বললেন, "আমি যদি ব্যাটা কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলির মুণ্ডু ছিঁড়ে না ফেলি!"

৯

বসার ঘরে শিরিন বানু গাণ্ডকে কোলে নিয়ে বসে আছেন, ছোট বাচ্চা নিয়ে কী করতে হয় তিনি খুব ভালো করে জানেন। বল্টু অবাক হয়ে আবিষ্কার করেছে এতক্ষণ হয়ে গেল গাণ্ড একবারও তাঁকে ভিজিয়ে দেয়নি। রইসউদ্দিন সন্ধে সাতটায় সময় বিউটি নার্সিং হোমটাকে দেখার জন্যে বের হয়ে গেছেন, যাবার আগে বলেছেন কিছুক্ষণের মাঝেই চলে আসবেন। ফোরকান আলির পকেটের সব কাগজপত্র অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেছেন, সেখানে নাকি নানা এলাকার মা-বাবা নেই সেরকম ছেলেমেয়ের নাম-ঠিকানা লেখা। কোন বাচ্চাকে কত টাকায় বিক্রি করা হবে সেগুলোও লেখা রয়েছে। বিউটি নার্সিং হোমের কয়েকজন ডাক্তারের নাম লেখা আছে, তাদেরকে কাকে কত দিতে হয় তাও লেখা আছে।

রইসউদ্দিন বলে গেছেন কিছুক্ষণের মাঝে ফিরে আসবেন, কিন্তু তিন ঘণ্টা হয়ে গেল এখনও তাঁর দেখা নেই। শিরিন বানু বেশ চিন্তিত হয়ে গেছেন, কী করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। শিউলির কেমন জানি ভয় লাগতে শুরু করেছে, বল্টু আর খোকনও একটু পরেপরে জানালার কাছে গিয়ে দেখছে রইসউদ্দিনকে দেখা যায় কি না। শুধুমাত্র গাণ্ড এবং মতলুব মিয়ার কোনোরকম দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। গাণ্ড শিরিন বানুর কোলে বসে তাঁর নাকটা কামড়ানোর চেষ্টা করছে, মতলুব মিয়া কয়েকবার হাই তুলে ঘুমাতে চলে গিয়েছে।

রাত সাড়ে দশটার সময় শিউলি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "রইস চাচার নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে।"

খোকন কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "এখন কী হবে?"

বল্টু বলল, "আমাদের যেতে হবে।"

শিরিন বানু চোখ কপালে তুলে বললেন, "কী বলছ তোমাদের যেতে হবে?"

শিউলি বলল, "বল্টু ঠিকই বলেছে আপা। আমাদের যেতে হবে।"

"তোমরা গিয়ে কী করবে?"

"দেখি কী করা যায়।"

শিরিন বানু কঠিনমুখে বললেন, "না শিউলি, বড়দের ব্যাপারে তোমরা মাথা ঘামাবে না। তোমরা সেখানে গিয়ে নতুন ঝামেলা তৈরি করা ছাড়া আর কিছু করবে না।"

শিউলি কিছু বলল না, শিরিন বানুর সাথে সোজাসুজি তর্ক করা সম্ভব নয়, বল্টু তাঁকে যে দারোগা আপা ডাকে, তার মাঝে খানিকটা সত্যতা রয়েছে। ঠিক এরকম সময়ে গাগুর নড়াচড়া দেখে কীভাবে জানি শিরিন বানু বুঝে গেলেন তাকে এক্ষুনি বাথরুমে নিয়ে যেতে হবে, তাকে বাথরুম করিয়ে ফিরে এসে দেখলেন ঘর খালি। শিউলি তার মাঝে বল্টু আর খোকনকে নিয়ে বের হয়ে গেছে।

রাত সাড়ে দশটা বেজে গেলেও রাস্তায় বেশ লোকজন। শিউলি, বল্টু আর খোকন বাসা থেকে বের হয়ে একটা রিকশা নিয়ে নিল। বিউটি নার্সিং হোমে পৌঁছে দেখতে পেল পুরো বিল্ডিংটা বন্ধ হলেও নার্সিং হোমের বেশ কয়েকটা ঘরে আলো জ্বলছে । শিউলি উপরে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, "রইস চাচা মনে হয় ঐ ঘরগুলোর কোনো-একটাতে আছেন।"

খোকন ভয়ে ভয়ে বলল, "তা হলে বের হয়ে আসছেন না কেন?"

"কে জানে, হয়তো বদমাইশগুলো বেঁধে রেখেছে।"

"বেঁধে রেখেছে? বেঁধে রেখেছে কেন?"

"তা তো জানি না, গিয়ে দেখতে হবে।"

"কেমন করে দেখবে শিউলি আপা?"

শিউলি উপরের দিকে তাকিয়ে মাথা চুলকাতে থাকে, বিউটি নার্সিং হোমের মানুষজনের চোখ এড়িয়ে কীভাবে ঘরের ভেতরে দেখা যায় সে চিন্তা করে পেল না। বল্টু পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, "আমি দেখে আসি।"

"তুই দেখে আসবি?" শিউলি অবাক হয়ে বলল, "তুই কীভাবে দেখে আসবি?"

"আগে বিল্ডিঙের ছাদে উঠে যাব, তারপর পানির পাইপ বেয়ে কার্নিসে নেমে আসব। কার্নিসে হেঁটে হেঁটে জানালার সামনে এসে দেখব ভিতরে রইস চাচা আছে কি না।"

শিউলি আঁতকে উঠে বলল, "কী? কী বলছিস? পানির পাইপ বেয়ে নেমে আসবি?"

"হ্যাঁ।"

"ভয় করবে না?"

"আমার ভয় করে না। মনে নাই আমি ঠিক করেছিলাম বড় হয়ে বিখ্যাত চোর হব?"

"তা ঠিক ।"

কাজেই কিছুক্ষণের মাঝে দেখা গেল বল্টু সিঁড়ি বেয়ে বিল্ডিঙের ছাদে উঠে গিয়ে কিছুক্ষণের মাঝে পাইপ বেয়ে নামতে শুরু করেছে। বিউটি নার্সিং হোমের কার্নিসে নেমে সে গুড়ি মেরে জানালাগুলোর দিকে এগিয়ে যায়। নিচে থেকে অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না, রাস্তা থেকে উপরের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়েও থাকা যায় না, রাস্তাঘাটে এখনও লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে, সবাই কৌতূহলী হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে থাকলে বল্টুর বিপদ হয়ে যাবে।

শিউলি আর খোকন নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে, মাঝে মাঝে চোখের কোনা দিয়ে উপরে তাকায় । আবছা অন্ধকারে মনে হল বল্টু একটা জানালার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছে। ভেতরে তাকাচ্ছে, এমনকি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে কিছু-একটা করছে। শিউলির বুক ধুকপুক করতে থাকে, বল্টু নিশ্চয়ই রইস চাচাকে খুঁজে পেয়েছে।

শিউলি বিনা কারণেই গলা নামিয়ে খোকনকে বলল, "চল, ওপরে যাই।"

"ওপরে?"

"হ্যাঁ। রাস্তায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে লোকজন সন্দেহ করবে। ছাদে উঠে যাই।"

খোকন ভয়ে ভয়ে বলল, "কিছু হবে না তো?"

"কী আর হবে? বল্টু গেল না!"

শিউলি আর বল্টু সিঁড়ি বেয়ে একেবারে বিল্ডিঙের ছাদে উঠে যায়। ছয়তলা বিল্ডিং, বিউটি নর্সিং হোমটা তিনতলায়। চারতলায় একটা কম্পিউটারের দোকান, পাঁচ আর ছয়তলায় নানারকম অফিস, বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে গেছে। নিচের তলাগুলো মোটামুটি আলো-ঝলমল হলেও পাঁচ আর ছয়তলা প্রায় অন্ধকার। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে শিউলির ভয় ভয় করতে থাকে। বিল্ডিংটা নিচে থেকে খুব সুন্দর দেখালেও ছাদটা একেবারে জঘন্য, ময়লা আবর্জনায় ভরা। অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে শিউলি আর খোকন ছাদের কিনারায় এসে দাঁড়াল। বৃষ্টির পানি যাওয়ার পাইপটা এখানেই রয়েছে, বল্টু এদিক দিয়েই উঠে আসবে।

কিছুক্ষণের মাঝেই বল্টু পাইপ বেয়ে উপরে উঠে এল, যেভাবে তরতর করে পাইপ বেয়ে উঠে এল যে দেখে মনে হল বল্টু বুঝি এভাবেই বিল্ডিঙে ওঠানামা করে। শিউলি বল্টুকে টেনে ছাদে নামিয়ে এনে বলল, "পেয়েছিস রইস চাচাকে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"মাঝখানের ছোট ঘরটার মাঝে।"

খোকন জিজ্ঞেস করল, "বেঁধে রেখেছে নাকি?"

"না।" বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "তবে মারধর করেছে মনে হল। কপালে আর পিঠে রক্ত দেখলাম।"

শিউলি জিজ্ঞেস করল, "তোর সাথে কথা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। বেশি কথা বলতে পারি নাই, একটা লোক চলে এসেছিল।"

"তোকে দেখেছে লোকটা?"

বল্টু মাথা চুলকে বলল, "মনে হয় দেখেছে।"

"সর্বনাশ!"

কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ খোকন শিউলির হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, "শিউলি আপু!"

"কী হয়েছে?"

"ঐ দেখো।"

শিউলি এবং বল্টু ঘুরে তাকিয়ে একেবারে জমে গেল। সিঁড়ির মুখে দুইজন বিশাল লোক দাঁড়িয়ে আছে, মানুষগুলোর এক হাতে মনে হল পিস্তল বা ছোরা—অন্ধকারে ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, অন্য হাতে টর্চলাইট, সেটা জ্বালিয়ে মনে হল কাউকে খুঁজছে।

শিউলি ফিসফিস করে বলল, "পানির ট্যাংকের পেছনে লুকিয়ে যা।"

সাবধানে গুড়ি মেরে তারা পানির ট্যাংকের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল হঠাৎ খোকনের পায়ে লেগে কী-একটা নিচে পড়ে গিয়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেল, সাথে সাথে দুটি ছয়-ব্যাটারির টর্চলাইটের উজ্জ্বল আলোতে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। মোটা গলায় একজন বলল, "দাঁড়া, খবরদার নড়বি না।"

শিউলি, বল্টু আর খোকন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। মোটা-গলার মানুষটা বলল, "হারামজাদা পোলাটা একলা আসে নাই, দল নিয়ে এসেছে।"

চিকন গলায় আরেকজন সুর করে বলল, "পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে। এই পিপীলিকাদের পাখা উঠেছে।"

"ধর শালাদের" বলে লোক দুইজন এসে তাদেরকে ধরে ফেলল। ছুটে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই, হাতে অস্ত্র থাকলে কিছু-একটা বিপদ হতে পারে জেনেও তিনজনেই খানিকক্ষণ হুটোপুটি করল, শেষ পর্যন্ত মানুষগুলো শক্ত করে শার্টের কলার এবং হাতের কবজি ধরে তিনজনকে কাবু করে ফেলল।

শিউলি চিকন গলায় একটা চিৎকার দেবে কি না ভাবছিল তখন মোটা-গলার মানুষটা তাদের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলে বলল, "মুখে একটা টুঁ শব্দ করেছিস তো লাশ ফেলে দেব। ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেব।"

আসলেই লাশ ফেলে দেবে কি না কে জানে, কিন্তু তারা আর কোনো ঝুঁকি নিল না।

দুজন মানুষ মিলে শিউলি বল্টু আর খোকনকে নিচে নামিয়ে এনে বিউটি নার্সিং হোমের নানা দরজা খুলে ছোট একটা ঘরে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দিল। ঘরের মেঝেতে এক কোনায় গালে হাত দিয়ে রইসউদ্দিন বসে ছিলেন, তাদের দেখে মনে হল খুব বেশি অবাক হলেন না, একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোমাদেরকেও ধরে ফেলেছে?'

"হ্যাঁ।"

যে-মানুষ দুইজন তাদের তিনজনকে ধরে এনেছে তারা বাইরে থেকে তালা মেরে চলে যাবার পর রইসউদ্দিন নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এরা একেবারে অর্গানাইজড ক্রিমিনালের দল।"

খোকন শুকনোমুখে জিজ্ঞেস করল, "তার মনে কী?"

"তার মানে এরা কঠিন বদমাইশ।"

খোকন কাঁচুমাচু-মুখে বলল, "এখন কী হবে আমাদের?"

রইসউদ্দিন খোকনের মুখের দিকে তাকালেন, বাচ্চাটির জন্যে হঠাৎ তাঁর মায়া হল, মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তুমি কোনো চিন্তা কোরো না।"

"চিন্তা করব না?"

"না। আমি কিছু-একটা ব্যবস্থা করব।"

রইসউদ্দিন কী ব্যবস্থা করবেন খোকন ঠিক জানে না, কিন্তু তাঁর কথায় সে সত্যি সত্যি ভরসা পেল।

রইসউদ্দিন সারা ঘরে খুব চিন্তিতভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর কপালের কাছে খানিকটা কেটে রক্ত পড়ছে, শার্টেরও খানিকটা জায়গা রক্তে ভেজা, তাঁকে দেখে খুব ভয়ংকর দেখাতে থাকে। তিনি কী করবেন কেউ জানে না, কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করারও সাহস পেল না।

রইসউদ্দিন বেশ খানিকক্ষণ পায়চারি করে শেষ পর্যন্ত দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সেখানে জোরে জোরে কয়েকটা লাথি দিলেন, তারপর হুংকার দিয়ে বললেন, "এই বদমাইশের দল, জানোয়ারের বাচ্চারা, দরজা খোল।"

দরজার লাথির শব্দেই হোক আর তাঁর বাজখাঁই ধমকের কারণেই হোক খুট করে দরজা খুলে গেল, দরজার অন্যপাশে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একটু আগে তারা শিউলিদের ছাদ থেকে ধরে এনেছে। দুজনের মাঝে যে হালকা-পাতলা সে মোটা গলায় বলল, "কী হয়েছে?"

রইসউদ্দিন এগিয়ে গিয়ে কথা নেই বার্তা নেই মানুষটাকে একটা ঘুসি বসিয়ে দিলেন। শক্ত ঘুসি, মানুষটা একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়ল। অন্য মানুষটা সাথে সাথে কোমরে গোঁজা একটা জংধরা ছোট রিভলবার বের করে চিৎকার করে বলল, "খবরদার, আর কাছে এলে গুলি করে খুলি ফুটো করে দেব।"

রইসউদ্দিন তবু ছুটে গিয়ে সেই মানুষটাকেও একটা রদ্দা লাগাতেন, কিন্তু তার আগেই শিউলি, বল্টু আর খোকন রইসউদ্দিনকে জাপটে ধরে ফেলল। মানুষটার মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হল সত্যি সত্যি গুলি করে দেবে।

যে-লোকটার মুখে রইসউদ্দিন ঘুসি মেরেছেন সেই মানুষটা মুখে হাত বুলাতে বুলাতে উঠে দাঁড়িয়ে বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইল। হুটোপুটি এবং চিৎকার শুনে ঘরে আরও কয়েকজন মানুষ চলে এসেছে, একজন একটু বয়স্ক, মুখে কাঁচাপাকা চাপদাড়ি। জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে বদি?"

যে-মানুষটা ঘুসি খেয়েছে সে গালে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, "বড় ত্যাঁদড় মানুষ। এখনও মারপিট করছে।"

চাপদাড়িওয়ালা মানুষটা দুশ্চিন্তার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "এখানে এত হৈচৈ হলে তো মুশকিল! লোকজনের ভিড় জমে যাবে।"

"কী করব ডাক্তার সাহেব, মাথা-খারাপ মানুষ, মারপিট ছাড়া কিছু বোঝে না।"

"ধরো শক্ত করে, একটা ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই।" বেশ কয়েকজন মানুষ এগিয়ে এল, রইসউদ্দিনকে চেপে ধরা খুব সহজ হল না, তিনি হাত-পা ছুড়ে কিল ঘুসি লাথি মেরে মানুষগুলোর সাথে ধস্তাধস্তি করে গেলেন। ছোট ঘর, ধস্তাধস্তির ধাক্কায় শিউলি, বল্টু আর খোকন একেকজন একেকবার একেকদিকে ছিটকে পড়ল। তার মাঝেই তারাও রইসউদ্দিনের পক্ষ নিয়ে খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি করল কিন্তু লাভ হল না, ছয়জন মানুষ মিলে রইসউদ্দিনকে চেপে ধরে রাখল আর চাপাদাড়িওয়ালা ডাক্তার একটা সিরিঞ্জ নিয়ে পুট করে তাঁর হাতে একটা ইনজেকশন ঢুকিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মাঝেই রইসউদ্দিন নেতিয়ে পড়লেন, সবাই তখন তাঁকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

যে-ছয়জন মানুষ রইসউদ্দিনকে চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করছিল তাদের সবার দেখার মতো একটা চেহারা হয়েছে। একজনের বাম চোখটা বুজে এসেছে, একজনের নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। দুজন ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে হেঁটে গেল। মোটামতন মানুষটা থু করে থুতু ফেলল, সেখানে তার একটা দাঁত বের হয়ে গেল। শুকনোমতো মানুষটা তার ঘাড় নাড়াতে পারছিল না। চাপদাড়িওয়ালা মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "এই মানুষটা তো দেখি ভেঞ্চারাস মানুষ!"

যে-লোকটার মার খেয়ে একটা দাঁত পড়ে গেছে সে কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "এইরকম মানুষ হলে আমি কোনো অ্যাকশানে নাই।"

যে-মানুষটা ঘাড় নাড়াতে পারছিল না সে পুরো শরীর ঘুরিয়ে বলল, "কোথা থেকে এসেছে এই মোষ?"

"বুঝতে পারছি না। কফিলউদ্দিন আর ফোরকান আলির পার্টি থেকে খোঁজ পেয়েছে মনে হল।"

যে-মানুষটার নাক থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে সে হাতের তালু দিয়ে রক্ত পরিষ্কার করে বলল, "আজেবাজে পার্টির সাথে কাজ করা ঠিক না। কোনদিন কী বিপদ হয়!"

চাপদাড়ি বলল, "এই পার্টি এতদিন তো রিলায়েবল ছিল। গত দুইটা কেস গোলমাল করেছে।"

"এখন কী করবেন ডাক্তার সাহেব?"

"দেখি চিন্তা করে। নিচে অ্যামবুলেন্সটা রেডি রাখতে বলো, এইগুলোকে যদি সরাতে হয় যেন গোলমাল না হয়।"

"জি আচ্ছা।" যে-দুজন ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে হেঁটে যাচ্ছিল তাদের একজন রইসউদ্দিনকে দেখিয়ে বলল, "এই পাগল আবার জেগে উঠবে না তো?"

চাপদাড়ি মাথা নাড়ল, "আরে না ! এত সহজে উঠবে না।"

"এই লোক যদি জেগে যায় আমি কিন্তু তা হলে ধারেকাছে নাই।"

দাঁত-পড়ে-যাওয়া মানুষটা কাঁদোকাঁদো মুখে বলল, "আমিও নাই।"

বাম চোখ বুজে-যাওয়া লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "আমি এর একশো হাতের মাঝে নাই।"

চাপদাড়ি মাথা নেড়ে বলল, "আরে না! ভয় পেয়ো না, এত সহজে এর ঘুম ভাঙবে না। কড়া এনস্থিশিয়া দিয়েছি।"

মানুষগুলো আবার তাদেরকে ঘরে তালা মেরে রেখে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার পর খোকন ফ্যাঁসফ্যাঁস করে একটু কেঁদে ফেলে বলল, "এখন কী হবে?"

বল্টু বলল, "ভয় পাসনে। এই দেখ—"

শিউলি অবাক হয়ে দেখল শার্টের নিচে বল্টুর প্যান্টে গোঁজা একটা রিভলবার। একটা চিৎকার দিতে গিয়ে কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে নিচু গলায় বলল, "রিভলবার! কোথায় পেলি?"

"যখন ধস্তাধস্তি করছিলাম তখন সবার পকেট মেরে দিয়েছি।"

"আর কী কী পেয়েছিস?"

বল্টু সবকিছু বের করে দেখাল, কুড়ি টাকার নোটের একটা বান্ডিল, ময়লা একটা রুমাল, একটা সিগারেটের প্যাকেট, একটা কালো সানগ্লাস, একপাতা মাথা ধরার ট্যাবলেট এবং পাগলের তেলের একটা বিজ্ঞাপন।

বল্টু মাথা নেড়ে বলল, "রিভলবার ছাড়া আর কোনো জিনিস কাজে লাগবে না।"

খোকন জিজ্ঞেস করল, "টাকা?"

"এই ঘরের ভেতরে আটকা থাকলে টাকা কী কাজে লাগবে?"

বল্টু চিন্তিতমুখে বলল, "তা ঠিক।"

খোকন মাথা নেড়ে বলল, "এখন কী করবে?"

শিউলি বলল, "রইস চাচাকে যদি ঘুম থেকে তোলা যেত তা হলেই চিন্তা ছিল না। এই রিভলবার নিয়ে একটা হুংকার দিতেন—সবাই ঠাণ্ডা হয়ে যেত!"

বল্টু মাথা নাড়ল, "গাণ্ডর মতো কাপড়ে পিশাব করে দিত।"

ওরা রইসউদ্দিনের কাছে গিয়ে তাঁকে ঘুম থেকে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু রইসউদ্দিন একেবারে গভীর ঘুমে, ধাক্কাধাক্কি করেও কোনো লাভ হল না। হাল ছেড়ে দিয়ে বল্টু বলল, "আমাদেরকেই চেষ্টা করতে হবে।"

"কীভাবে?"

"আমি রিভলবারটা হাতে নিয়ে চিৎকার করব, তোমরাও চিৎকার করবে।"

শিউলি বল্টুর দিকে তাকাল, এইটুকুন মানুষ—হাতে রিভলবার কেন, একটা মেশিনগান নিয়ে দাঁড়ালেও কেউ তাকে দেখে ভয় পাবে বলে মনে হয় না। কী করা যায় সেটা নিয়ে যখন চিন্তা করছে তখন খোকন বলল, "এক কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ?"

"আমরা কোনোমতে ঠেলেঠুলে রইস চাচাকে দাঁড়া করিয়ে রাখি, ভান করি চাচা জেগে আছেন।"

"সেটা করে কী লাভ?"

"দেখ নাই চাচাকে কেমন ভয় পায়।"

"কিন্তু দেখেই বুঝে যাবে!"

"আমি রইস চাচার গলায় কথা বলব। ঐ যে ভেন্টি-কুন্টি না কী যে বলে সেইভাবে!"

শিউলি হঠাৎ করে চমকে উঠল, এটি সত্যি একটি উপায় হতে পারে। খোকনের দিকে তাকিয়ে বলল, "পারবি তুই?"

নিচে শুয়ে-থাকা রইসউদ্দিন হঠাৎ কথা বলে উঠলেন, "না পারার কী আছে!"

শিউলি আর বল্টু চমকে উঠল, এক মুহূর্ত লাগে বুঝতে যে আসলে খোকনই কথা বলছে। শিউলি হাততালি দিয়ে বলল, "ফাস্ট ক্লাস!"

পরিকল্পনার প্রথম অংশটা নিয়ে অবিশ্যি খুব সমস্যা হল, ঘুমিয়ে-থাকা একজন মানুষকে দাঁড় করিয়ে রাখাই অসম্ভব, হাতে রিভলবার ধরানোর তো কোনো প্রশ্নই আসে না। খানিকক্ষণ চেষ্টা করে তারা হাল ছেড়ে দিল । বল্টু বলল, "উহুঁ। দাঁড় করানো যাবে না।"

শিউলি বলল, "তা হলে বসিয়েই রাখি।"

"ঠিক আছে।"

তিনজন মিলে রইসউদ্দিনকে টেনে ঘরের কোনায় নিয়ে সেখানে তাঁকে কোনোমতে বসিয়ে দেওয়া হল। একটা পা ভাঁজ করে সেখানে একটা হাত রেখে সেই হাতে রিভলবারটা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল—ঘুমের মাঝে একটু পরেপরে হাতটি এলিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কাজেই সেটাকে স্থির রাখতে ওদের জান বের হয়ে গেল। তবুও অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত রইসউদ্দিনকে রিভলবার-হাতে বসানো হল, কিন্তু ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আছে দেখে দৃশ্যটাকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বল্টু বলল, "কালো চশমাটা পরিয়ে দিই।"

শিউলি হাতে কিল দিয়ে বলল, "ঠিক বলেছিস!"

রইসউদ্দিনের চোখে কালো চশমা পরানোর পর দেখে মোটামুটিভাবে মনে হতে থাকে মানুষটা একটি রিভলবার-হাতে ঘরের কোনায় বসে আছে। এইবারে নার্সিং হোমের লোকজনকে ডেকে আনার কাজ। দরজায় জোরে জোরে কয়েকটা লাথি দিলেই সেটা হয়ে যাবে বলে মনে হয়। কিন্তু তার দরকার হল না, হঠাৎ করে দরজা খুলে গেল এবং একটু আগে যারা রইসউদ্দিনের সাথে মারামারি করেছে তাদের কয়েকজন দরজায় উঁকি দিল। মনে হয় ধস্তাধস্তির সময় বল্টু যাদের পকেট মেরে দিয়েছে তারা তাদের জিনিসপত্র খুঁজতে এসেছে।

দরজা খোলামাত্রই শোনা গেল রইসউদ্দিন একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়েছেন, "দুই হাত ওপরে তুলে দাঁড়াও বদমাইশের দল।"

মানুষগুলো হকচকিয়ে উঠে দৌড় দিতে গিয়ে থেমে গেল, হঠাৎ আবিষ্কার করল ঘরের কোনায় রইসউদ্দিন তাদের দিকে রিভলবার তাক করে বসে আছেন। রাত্রিবেলা কেন কালো চশমা পরে আছেন, একেবারেই কেন নড়াচড়া করছেন না এবং ঘুমের

ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবার পরও মানুষটা কেমন করে এত তাড়াতাড়ি জেগে উঠল এই ব্যাপারগুলো নিয়ে তাদের মনে সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোনো সন্দেহ হল না। একটু আগে রইসউদ্দিনের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে তার সম্পর্কে একটা ভীতি জন্মে গেছে, তাঁর ধমক খাবার পর তারা কেউ পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছিল না।

রইসউদ্দিন আবার ধমক দিলেন, "হাত তুলে দাঁড়াও বদমাইশের দল । না হলে গুলি করে খুলি ফুটো করে দেব।"

কথা বলার সময় রইসউদ্দিনের কেন ঠোঁট নড়ছে না সেটা নিয়েও তাদের মনে কোনো সন্দেহ হল না । তারা হাত তুলে দাঁড়াল।

"শিউলি আর বল্টু, তোমরা বেঁধে ফেলো বদমাইশগুলোকে।"

"কী দিয়ে বাঁধব?" বল্টু মাথা চুলকে বলল, "দড়ি কই? তার চেয়ে এক কাজ করি।"

"কী কাজ?"

"এদের প্যান্ট খুলে ফেলি। প্যান্ট খুলে রাখলে দৌড়ে পালাতে পারে না।"

রইসউদ্দিন কিছু বলার আগেই চাপদাড়ি ডাক্তার হাজির হল, রইসউদ্দিন একটা হুংকার দিলেন, "ধর ব্যাটা বদমাইশকে। কত বড় সাহস, আমাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করে!"

চাপদাড়ি ডাক্তার ঠিক বুঝতে পারছিল না কী হচ্ছে, তখন চোখ-বুজে-যাওয়া মানুষটা ফিসফিস করে বলল, "মানুষটা জেগে গেছে।"

"জেগে গেছে! কী আশ্চর্য!"

"কথা বলে কে? হাত তোলো উপরে । না হলে গুলি করে খিলু বের করে ফেলব।"

চাপদাড়ি ডাক্তার পালানোর চেষ্টা করল কিন্তু ততক্ষণে শিউলি আর বল্টু তার উপরে লাফিয়ে পড়েছে, পা তুলে হাঁটুতে প্রচণ্ড লথি মেরে তাকে শুইয়ে দিল।

"ভেরি গুড!" রইসউদ্দিন বললেন, "তোমরা এখন বাইরে গিয়ে কয়েকজন মানুষকে ডেকে আনো।"

"এরা যদি পালিয়ে যায়?"

"পালাবে না। আমি দেখছি, একটু নড়লেই ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব গুলি করে।"

শিউলি আর বল্টু ঘর থেকে বের হয়ে একটা ওয়েটিংরুমের মতো এলাকায় এল, সেখান থেকে একেবারে নার্সিং হোমের বাইরে। কাকে ডেকে আনা যায় চিন্তা করছে ঠিক তখন সিঁড়িতে বুটের শব্দ শোনা গেল, শিউলি আর বল্টু দেখল পুলিশ এসেছে। এমনিতে পুলিশ দেখলেই বল্টুর বুক কেঁপে ওঠে, আজ অবিশ্যি ভিন্ন কথা। সে শিউলির সাথে সাথে ছুটে গেল পুলিশের কাছে । যখন হড়হড় করে পুলিশকে ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছে তখন দেখতে পেল পিছুপিছু গাগুকে কোলে নিয়ে শিরিন বানু এসেছেন। শিরিন বানুই নিয়ে এসেছেন পুলিশকে। আর কোনো ভয় নেই, শিউলি আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

নার্সিং হোমের ভেতরে মানুষগুলোকে যখন পুলিশ অ্যারেস্ট করছে তখন শিরিন বানু রইসউদ্দিনের কাছে গিয়ে বললেন, "আপনি রাত্রিবেলা এই সানগ্লাস পরে বসে আছেন কেন?"

রইসউদ্দিন কোনো কথা বললেন না । শিরিন বানু একটু কাছে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ রইসউদ্দিনের নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলেন। শিরিন বানু আরেকটু কাছে গিয়ে রইসউদ্দিনকে ডাকলেন, "রইস সাহেব!"

রইসউদ্দিন এবারেও কোনো কথা বললেন না। শিরিন বানু হাত দিয়ে রইসউদ্দিনকে ছোট একটা ধাক্কা দিতেই হঠাৎ রইসউদ্দিন গড়িয়ে পড়ে গেলেন। ভয় পেয়ে চিৎকার করে

শিরিন বানু লাফ দিয়ে পেছনে সরে গেলেন। শিউলি হিহি করে হেসে বলল, "রইস চাচা ঘুমাচ্ছেন আপা!"

"ঘুমাচ্ছেন ! রিভলবার হাতে নিয়ে ঘুমাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ আপা।"

ব্যাপারটি কী বুঝিয়ে বলার সময় চাপদাড়ি এবং তার সব সাঙ্গোপাঙ্গ কান খাড়া করে রাখল। একজন মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কীভাবে এতগুলো মানুষকে কাবু করে ফেলতে পারে সেটি নিজের কানে শুনেও তারা ঠিক বিশ্বাস করতে পারল বলে মনে হয় না।

১০

দুপুরবেলা বসার ঘরে রইসউদ্দিন খবরের কাগজ পড়ছেন, বল্টু আর খোকন বসে বসে ষোলোগুটি খেলছে। শিউলি কার্পেটে পা ছড়িয়ে বসে আছে, গাগু মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে শিউলির পায়ের বুড়ো আঙুল নিজের মুখের মাঝে ঢুকিয়ে মাড়ি দিয়ে কামড়ানোর চেষ্টা করছে। দরজার কাছে বসেছিল মতলুব মিয়া, বরাবরের মতো তার মুখ অত্যন্ত বিরস, কেনে আঙুল কানে ঢুকিয়ে সে খুব দ্রুতগতিতে কান চুলকে যাচ্ছে। এরকম সময় দরজায় শব্দ হল। বল্টু ক্যাকাশে-মুখে বলল, "সর্বনাশ! দারোগা আপা নাকি?"

মতলুব মিয়া দরজা খুলে দেখল দারোগা আপা নয়, পিয়ন চিঠি নিয়ে এসেছে। খাম দেখেই বোঝা গেল আমেরিকার চিঠি। শিউলি হাততালি দিয়ে বলল, "ছোট চাচার চিঠি! ছোট চাচার চিঠি!"

রইসউদ্দিন খাম খুলে চিঠি বের করে পড়তে শুরু করলেন। শিউলি দেখতে পেল পড়তে পড়তে রইস চাচার মুখ কেমন জানি দুখি-দুখি হয়ে গেল। শিউলি একটু ভয়-পাওয়া গলায় বলল, "কী হয়েছে রইস চাচা? কী লেখা আছে চিঠিতে?"

রইসউদ্দিন খুব কষ্ট করে হেসে বললেন, "তোমার ছোট চাচা তোমাকে নিতে আসছেন।"

"সত্যি?" শিউলি হঠাৎ আবিষ্কার করল তার গলার স্বরেও আনন্দের বদলে কেমন যেন একধরনের দুঃখ-দুঃখ ভাব ফুটে উঠল।

খোকন ষোলোগুটি খেলার একটা মোক্ষম চাল বন্ধ করে রেখে শিউলির দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি আমেরিকা চলে যাবে আপু?"

শিউলি কোনো কথা না বলে নিচের দিকে তাকিয়ে রইল।

বল্টু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ। শিউলি আপা যাবে আমেরিকা। আমরাও যার যার জায়গায় যাব।"

"গাগু? গাগু কোথায় যাবে?"

মতলুব মিয়া তার কান চুলকাতে চুলকাতে বলল, "এতিমখানায় । ভালো এতিমখানা আছে। পর্দা-পুশিদা ভালো।"

শিউলি গাগুকে কোলে তুলে নিয়ে তার বুকে চেপে ধরে রাখল, এই ছোট শিশুটিকে এতিমখানায় ছেড়ে সে আমেরিকা চলে যাবে? হঠাৎ করে তার চোখে পানি এসে যেতে চায়, শিউলি কষ্ট করে চোখের পানি আটকে রাখল। সবার সামনে কেঁদে ফেললে কী-একটা লজ্জার ব্যাপার হবে!

"শিউলি আপু—" খোকন এগিয়ে এসে বলল, "তুমি আমেরিকা থেকে আমাদের কাছে চিঠি লিখবে?"

"চিঠি!" বল্টু মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, "আমাদের কি কোনো ঠিকানা আছে চিঠি লেখার? তুই থাকবি কোনো জঙ্গলে আমি থাকব কোনো রাস্তায়—"

"তা হলে? তা হলে আমরা জানব কেমন করে শিউলি আপা কেমন আছে?"

"জানতে হবে তোকে কে বলেছে? আমরা কি সত্যিকার ভাইবোন?"

খোকন কেমন যেন ব্যথিত চোখে বল্টুর দিকে তাকিয়ে রইল। মনে হল হঠাৎ করে সে যেন এই প্রথমবার বুঝতে পারল তারা আসলে সত্যিকারের ভাইবোন নয়। কয়েকদিনের জন্যে তারা একসাথে এসেছিল, সময় ফুরিয়ে গেলে যার যেখানে যাবার কথা ছিল সে সেখানে চলে যাবে।

খোকনের চোখে হঠাৎ পানি এসে যায়, অনেক কষ্ট করে সে কান্না আটকে রাখার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না । তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি বের হয়ে এল। শিউলি বলল, "কাঁদছিস কেন গাধা, তোর যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবি, স্কুলে যেতে হবে না, কিছু না—"

বলতে বলতে শিউলি নিজেই হঠাৎ হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। খোকনকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "তুই কেন আমার এত মন-খারাপ করিয়ে দিচ্ছিস? কেন? বোকার মতো কেন কাঁদছিস?"

খোকন চোখ মুছে বলল, "ঠিক আছে আপু আর কাঁদব না।"

কিন্তু তার পরেও সে আরও কিছুক্ষণ কাঁদল। গাণ্ড বুঝতে পারল না কেন হঠাৎ করে সবাই কাঁদতে শুরু করেছে। সে হাত দিয়ে শিউলির চোখ মুছে তাকে আনন্দ দেবার জন্যে মাড়ি বের করে চোখ ছোট ছোট করে হাসার চেষ্টা করল।

বল্টু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "পৃথিবীতে সবাই কি আর সবসময় একসাথে থাকতে পারে? পারে না।"

রইসউদ্দিন এতক্ষণ চুপ করে বসে এদের কথা শুনছিলেন, এবারে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "বল্টু আর খোকন, শিউলির ছোট চাচা যখন শিউলিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাকে নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই। এতদিন একসাথে ছিল, একটা মায়া পড়ে গেছে, তাই চলে গেলে খুব কষ্ট হবে। কিন্তু কী আর করা? আমার কষ্ট হবে বলে তো জীবন থেমে থাকবে না!"

কেউ কোনো কথা বলল না, রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইল। রইসউদ্দিন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "যা বলছিলাম, বল্টু আর খোকন, তোমাদের সবার জন্যেই মায়া পড়ে গেছে, তোমরা সবাই একসাথে চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। তাই আমার মনে হয়—"

রইসউদ্দিন বল্টু আর খোকনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা আমার সাথে থেকে যাও। আমি একা মানুষ, তোমরা থাকলে ভালো লাগবে। আমার তো কখনো ছেলেপুলে ছিল না, তাই ছেলেপুলের উপরে কেমন মায়া হয় জানতাম না। তোমাদের দেখে বুঝেছি—ছেলেপুলের জন্যে মায়া কেমন।"

রইসউদ্দিনের গলা ধরে গেল, তিনি চুপ করে গেলেন। রইসউদ্দিন মানুষটা একটু কাঠখোট্টা ধরনের । এ-ধরনের কথা বলা তাঁর জন্যে খুব সহজ নয়। বল্টু আর খোকন একধরনের বিস্ময় নিয়ে রইসউদ্দিনের দিকে তাকিয়ে রইল, তখন মতলুব মিয়া মাথা

নেড়ে নেড়ে বলল, "না-না-না ভাই, আপনি এটা কী ধরনের কথা বললেন? রাস্তা থেকে দুইজন ধরে এনে নিজের ছেলে বলে রেখে দেবেন? কী বংশ কী জাত কিছু জানেন না। খোঁজখবর নিবেন না—"

রইসউদ্দিন মতলুব মিয়াকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "মতলুব মিয়া, কিছু-কিছু ব্যাপার তুমি কোনোদিন বুঝবে না। সেইটা নিয়ে খামোকা কথা বোলো না। তোমার সময় নষ্ট আমাদের সময় নষ্ট। এরা আমার জন্যে যা করেছে নিজের ছেলেমেয়েরাও তা করে না। এদের যদি আমি নিজের ছেলেমেয়ে না ভাবি পৃথিবীতে আর আমার কোনো আপন মানুষ থাকবে না।"

ধমক খেয়ে মতলুব মিয়া চুপ করে গেল। রইসউদ্দিন আবার ঘুরে তাকালেন বল্টু আর খোকনের দিকে, বললেন, "কী হল বল্টু আর খোকন? থাকবে আমার সাথে?"

বল্টু আর খোকন কিছু বলার আগে শিউলি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, চোখ বড় বড় করে বলল, "বল্টু আর খোকনের সাথে আমিও থাকতে পারি?"

"তুমি?" রইসউদ্দিন অবাক হয়ে বললেন, "তুমি?"

"হ্যাঁ। আমি?"

"আর তোমার ছোট চাচা?"

"আমি যাব না ছোট চাচার সাথে, আমি তোমার সাথে থাকব। প্লীজ তুমি না কোরো না।" শিউলি কাতর গলায় বলল, "প্লী-ই-ই-জ!"

রইসউদ্দিন জীবনে যেটা কখনো করেননি সেটা করে ফেললেন, হাত বাড়িয়ে শিউলিকে নিজের কাছে টেনে এনে বুকের মাঝে চেপে ধরে বললেন, "মা, তুমি যদি আমার সাথে থাকতে চাও কখনো কি আমি না করব! মানুষ কি কখনো নিজের মেয়েকে দূর করে দেয়?"

শিউলি রইসউদ্দিনের শার্ট ধরে ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলে বলল, "আমরা সবাই একসাথে থাকব। সবসময়। বল্টু, খোকন আর আমরা হব ভাইবোন, তুমি হবে আমাদের আব্বু।"

রইসউদ্দিন মাথা নাড়লেন, "ঠিক আছে মা।

"আমরা একসাথে শিশুপার্কে যাব, তুমি আমাদের বেলুন আর হাওয়াই মিঠাই কিনে দেবে।"

"কিনে দেব।"

"ঈদে তুমি আমাদের নতুন জামা কিনে দেবে।"

"কিনে দেব।"

"ঈদের দিন বল্টু আর খোকন আর তুমি পায়জামা-পাঞ্জাবি পরবে আর আমি নতুন জামা পরে সবার বাসায় বেড়াতে যাব।"

"বেড়াতে যাব।"

"আর কেউ আমাদের বাসায় এলে আমরা তাকে সেমাই খাওয়াব।"

রইসউদ্দিন কিছু বলার আগেই বল্টু বলল, "আমার সেমাই ভালো লাগে না।"

রইসউদ্দিন হাত বাড়িয়ে খোকন আর বল্টুকে নিজের কাছে টেনে এনে বললেন, "আচ্ছা সেটা সময় হলে দেখা যাবে। সেমাই না রেঁধে আমরা জর্দা রাঁধতে পারি, ফিরনি রাঁধতে পারি!"

এরকম সময় গাণ্ড গড়িয়ে গড়িয়ে তাদের কাছে চলে এসে রইসউদ্দিনের পায়ের বুড়ো আঙুলটা ধরে সেটা মুখে পুরে মাড়ি দিয়ে কামড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। শিউলি চিৎকার করে বলল, 'সর্বনাশ!"

"কী হল?"

"গাণ্ডর কথা আমরা ভুলেই গেছি! গাণ্ড কার সাথে থাকবে?"

রইসউদ্দিন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "আগে খোঁজ করে বের করতে হবে তার নিজের বাবা-মা আছে কি না।"

"যদি না থাকে? খুঁজে না পাওয়া যায়?"

"তা হলে তো আমাদের সাথেই থাকবে। তবে—"

"তবে কী?"

"খুব কষ্ট হবে আমাদের। এত ছোট বাচ্চা কীভাবে দেখেশুনে রাখতে হয় আমরা তো কেউই জানি না।" রইসউদ্দিন খুব চিন্তিত হয়ে তাঁর মাথা চুলকাতে লাগলেন।

শিউলির মুখে হঠাৎ দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল। সে বলল, "চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

"কারণ নেই?"

"না।"

"কেন?"

"সময় হলেই তুমি দেখবে!"

যে-কথাটি শিউলি রইসউদ্দিনের কাছে গোপন রেখেছিল সেটি সে বল্টু আর খোকনের কাছে গোপন রাখেনি। ছোট বাচ্চা মানুষ করার জন্যে দরকার হচ্ছে একটি মা। ভাইবোন এবং বাবা যেরকম করে জোগাড় হয়েছে ঠিক সেরকম একটা মা জোগাড় করতে হবে। তাদের 'দারোগা আপা' থেকে ভালো মা কে হতে পারে!

বল্টু আর খোকন শিউলির কথা বিশ্বাস করেনি। তাদের ধারণা কাজটা অসম্ভব, শিউলি বলল, সে তিনমাসে মায়ের সমস্যা সমাধান করে দেবে—এক ডজন হাওয়াই মিঠাই বাজি ধরেছিল সেটা নিয়ে।

শিউলি বাজিতে হেরে গিয়েছিল।

তিন মাসে পারেনি—সাড়ে তিন মাস সময় লেগেছিল।

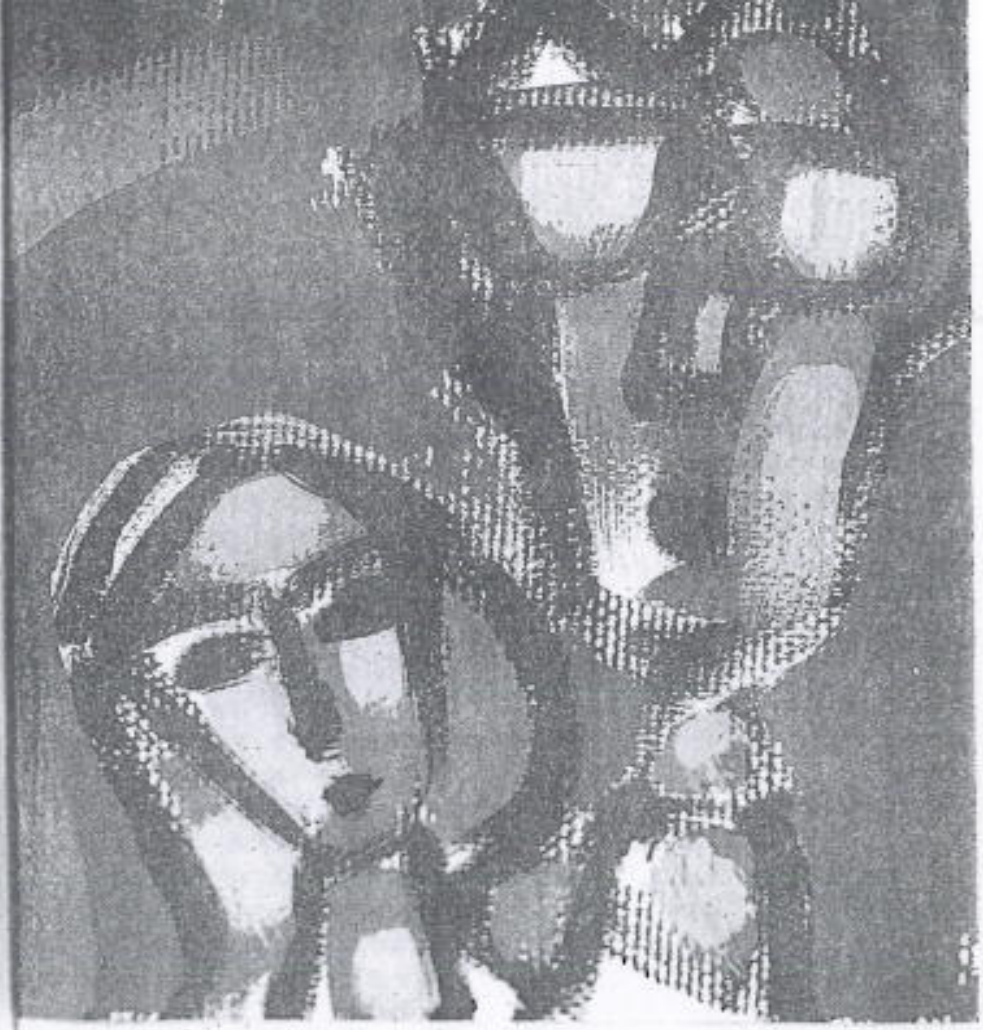

বুবুনের বাবা